প্র থ ম সং স্ক র ণ

শ্রাবণ, ১৩৪০

আগষ্ট, ১৯৩৩

ইন্দ্রাণী

গ্রন্থকারের আর-আর বই

কবিতা

প্রিয়া ও পৃথিবী
অমাবস্যা

গল্প

টুটাফুটা
ইতি
অধিবাস
দিগন্ত
অকাল বসন্ত
নায়ক-নায়িকা

উপন্যাস

বেদে
প্যান
আকস্মিক
কাকজ্যোৎস্না
প্রথম প্রেম
ছিনিমিনি
মুখোমুখি
জননী জন্মভূমিশ্চ
ঊর্ণনাভ
ইন্দ্রাণী

কিশোর-কিশোরীর

ডাকাতের হাতে
আকাশ-প্রদীপ
সবুজ নিশান

ইন্দ্রাণী

এক

পাড়ার কোন্ একটি চেনা মেয়ে ঘোড়ার গাড়ির জান্‌লার পাখি তুলে জলজ্যান্ত দিনের আলোয় সহরের রাস্তা দিয়ে ষ্টেশনের দিকে যাচ্ছিলো বলে' রাজীবলোচন তা'র নামে কী কীর্ত্তিটাই সেদিন রটিয়েছিলো: ঘোমটার তলা থেকেও মেয়েরা যদি চোখ চাইতে থাকে, তবে দেশের আর উচ্ছন্ন যেতে বাকি কী! তারপর তা'র ছোট বোন দশ বছরের ভুনি যেদিন পাশের অমৃতদের বাড়ি গিয়ে তা'র নতুন-কেনা সিঙ্গ্‌ল-রিড্ হার্মোনিয়ামের একটা চাবি টিপে হঠাৎ মনের আনন্দে বলা-কওয়া-নেই মুখব্যাদান করলে, রাজীব সেদিন নিতান্ত মেয়ে বলে'ই তা'র মাথাটা গুঁড়ো করে' ধূলোর সঙ্গে মিশিয়ে দেয় নি। তা'র একগোছ চুল উঠে এসেছিলো হাতের মুঠোয়, ডান কানের মাকৃড়িটা কোথায় যে ছিঁড়ে পড়ে' গিয়েছিলো তা'র আর কোনো সন্ধানই মিল্‌লো না। মা ছুটে রাজীবকে বাধা দিতে এলে রাজীব ভুনির পিঠে পাহাড়-প্রমাণ একটা কিল বসিয়ে দাঁত খিঁচিয়ে ব'লেছিলো: যা, বাইজি হ'গে যা, ধিঙ্গি হ'য়ে এখানে আছিস কেন আর মরতে? গলা ছেড়ে উনি আবার

গান ধরেছেন, গা' না আরো খানকতক। বলে' আবার আরেকটা কিল।

এই ছিলো রাজীব, কৈশোরে। যৌবনে কল্‌কাতার কলেজে পড়তে এসেও, স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে তা'র মতগুলি সে নরম করতে পারলো না। তবে, হাতের শক্তিটা আর হাতে না থেকে এসেছে এখন কলমের মুখে। দৈনিকে-সাপ্তাহিকে শ্রীনিধিরাজ সামন্তের ছদ্মনামে সে লিখতে লাগ্‌লো সব ভীষণ-ভীষণ সারগর্ভ প্রবন্ধ, সমাসবদ্ধ বাক্যের বিদ্যুতে বেচারা বাঙলা-সাহিত্যকে সে ধাঁধা লাগিয়ে দিলে। স্ত্রীশিক্ষা বল্‌তে বিলিতি কেতায় হ্যাণ্ড-সেইক্ করা বা স্বামীর কন্থই ধরে' গড়ের মাঠে হাওয়া খাওয়া নয়, সত্যিকারের স্ত্রীশিক্ষা বল্‌তে বাঙালি মেয়েদের রান্নাঘর ও ঠাকুরঘর, গুরুজনের সেবা আর বাধ্যতা। নিজেদের রামায়ণ-মহাভারত না পড়ে' পড়তে গেছে তা'রা শেক্‌স্‌পিয়র আর শেলি: সীতা-সাবিত্রীর আর্য্য আদর্শ ছেড়ে অনুসরণ করছে হায়, বিলিতি পেটিকোট। সত্যবানের মৃতদেহে নতুন জীবন সঞ্চার করবার সাধনার বদলে স্বামীর তিরোধানের পর অন্যের ঘরণী হ'বার লালসা। নেই সেই নিষ্ঠা, নেই সেই নির্ম্মলতা। শিখেছে কেবল শাড়ি ফুলিয়ে শরীরের উপর ঢেউ তুলতে, দিতে যতো সাজসজ্জার চেক্‌নাই, দেখাতে যতো খোঁপার হাত-প্যাঁচ। এদিকে ঘাটে নেমে কল্‌সি করে' জল তুলতে গেলে হাঁপায়, উনুন ফুঁয়াতে গেলে চোখে দেখে সর্ষে-ফুল। না পারে কুলোয় করে' চাল ঝাড়তে, মাটির পিঁড়ে লেপ্‌তে, ন্যাকড়ার ফালি ছিঁড়ে সল্‌তে পাকাতে। হায়, হায়, সেই সুখের দিন

কবে অস্ত গেছে, মেয়েরা আজকাল ঢেঁকিতে দেয় না পাড়, কাটে না আর নারকোলের সরু চিড়ে, পাথরের থালা ভরে' আম গুলে দেয় না আর আমস্বত্ব। সেই দিন কি আর ফিরে আসবে না—মাছের আলু আর তরকারির আলু আলাদা করে' মেয়েরা আবার কুটতে শিখবে, মাটির সাজ তৈরি করে' ভাজবে আবার আস্‌কে-পিঠে, পিটুলি করে' দেবে আবার লক্ষ্মীর আল্‌পনা। সেই রামও নেই, অযোধ্যাও নেই। ফ্যাসানের বন্যায় মেয়েরা আজকাল একেকটা ফাঁপানো ফেনা। কোথায় বা সেই পিঁড়ি-চিত্র, কোথায় বা সেই কাঁথার উপর কল্কা কাটা। শিখেছে কেবল দু' চারটে বিলিতি বুক্‌নি, কোলকুঁজো হ'য়ে বই নিয়ে বসে' ঝিমুতে। দেশের দুর্গতি এসেছে ঘোরালো হ'য়ে। একে বাঁচাতে হ'লে চাই ফের সনাতন যুগে ফিরে যাওয়া, তা'র সমাজের আদর্শকে ফের প্রতিষ্ঠা করা। গরম দেশে বিলিতি মদ পরিপাক করা যাবে না, তাতে শক্তি না এসে আসবে মত্ততা : এ-দেশে চাই কালো পাথরের গ্লাশে ঠাণ্ডা মিছ্‌রি-পানা, শুক্‌তো আর মাছের ঝোল।' বিলিতি সাফ্রেজিষ্ট্‌এর বদলে ব্রীড়াবনতমুখী গৃহলক্ষ্মী।

তারপর রাজীবলোচন বিয়ে করলো। যুগের উপযোগী ঠিক সময়েই বলতে হ'বে, অর্থাৎ তা'র বয়েস যখন উনিশ। বিয়ে হ'লো ত্রিদিব গাঙ্গুলির মেয়ের সঙ্গে—বয়েসে সে-ও যুগের আদর্শকে অক্ষুন্ন রেখেছে। যমপুকুরের ব্রত শেষ করে' সবে আবির দিয়ে মাঘমণ্ডলের সে আঁক টানছে। নাম ছিলো তা'র কামিনী, রাজীবলোচনের সে-নাম পছন্দ হ'লো না : ও-নামটা

ই ন্দ্রা ণী

নেহাৎ একাল-ঘেঁসা, তা'র আবহাওয়ায় রয়েছে আদিরসের ঝাঁজ. অতএব সে-নাম সে বদ্‌লে নিলো কামাখ্যাতে। গড়ে'-পিটে তা'কে সে লেগে গেলো মানুষ করতে। চিঠিতে পাঠ দিতে শেখালো 'পরমপূজনীয়েষু', বইয়ের মধ্যে রাখলো শুধু 'সীতার বনবাস'। ঠেললো তাকে হেঁসেলে, হাঁড়িকুঁড়ির আস্তকুঁড়ে; সেখান থেকে প্রমোশান দিলে আঁতুড়ঘরে, কাঁথা-পেনির আবর্জ্জনায়। অথচ স্বামীর সামনে দিনের বেলায়, সূর্য্যের আলোয় তা'র দেখা দেওয়া বারণ: তা'র ইঞ্চি-মাপা ঘোম্‌টা। দুপুরবেলা, রাজীবলোচন কলেজে গেলে, বসে'-বসে' সুপুরি কাটো, তেঁতুল ছাড়াও, জাঁতা ঘুরিয়ে ডা'ল ভাঙো। আর বিলাসিতা একাধটু যদি করতে চাও তো পাড়ার মেয়েদের নিয়ে গোলামচোর খেল বা ঘুমে খানিক গড়াগড়ি দাও। ব্যস্‌, এই পর্য্যন্ত। বিকেল হ'তে-না-হ'তেই অলক্ষ্যে আবার স্বামি-সেবার তোড়জোড় সুরু করো; তুমি লক্ষ্যীভূত হ'বে, অন্ধকারে রাত যখন আসবে ঘনিয়ে। তোমার অস্তিত্ব শুধু অন্ধকারেই।

দুই

সনাতন কাল স্থির হ'য়ে বসে' রইলো, কিন্তু সময় চল্‌লো এগিয়ে। শত-লক্ষ রাজীবলোচনও তা'কে—তা'র দুর্বার, উদ্ধত স্রোতকে ঠেকাতে পারলো না। আর এমনি তা'র ধার যে বড়ো-বড়ো পাহাড় পর্য্যন্ত ক্ষয় পেয়ে-পেয়ে তা'র স্রোতকে অনুকূল পথ করে' দিলে।

হাওয়া এসেছে জোরে। নদীতে জোয়ার। রাজীবলোচনকেও একটু-একটু করে' পাল তুলে দিতে হ'লো। আস্তে-আস্তে কী করে' যে অনায়াসে সে এই সময়ের স্রোতে গা ভাসাচ্ছে, ঠিক কিছু সে খেয়াল করতে পারছে না। চারদিকে তাকিয়ে কোথাও সে আর খুঁজে পায় না অসঙ্গতি, এতোটুকু কোথাও প্রতিবাদ। সময় এখন দুর্দ্ধর্ষ যে তা'র সঙ্গে সম্মিলিত কণ্ঠে সবাই সায় দিয়ে উঠেছে। সে এমন-কী ধুরন্ধর এসেছে, তা'র বিরুদ্ধে একা যাবে যুঝতে? যখন যা সময়, তখন তা-ই সমাজ। সময় এমন দুর্দ্ধর্ষ যে তা'কে পর্য্যন্ত ভুলিয়ে দিয়েছে তা'র আগেকার সময়ের কথা। তা'র সঙ্গে পেরে উঠবে এমন সাধ্য কা'র?

হ্যাঁ, রাজীবলোচনের মেয়ে ইন্দ্রাণীর কথাই বলছি।

ই ন্দ্রা ণী

রাজীবলোচনের মতামত থেকেই স্পষ্ট টের পাওয়া যায় তা'র আর্থিক অবস্থা বিশেষ স্বচ্ছল নয়, কেননা অর্থের অপব্যবহার করবার পথ করতে গিয়ে নিশ্চয়ই তাকে প্রাচীন অন্ধকূপ থেকে মাঝে-মাঝে খোলা রাস্তায় বেরিয়ে আসতে হ'তো। অর্থের নির্গমের জন্যে তা'র সংস্কারের দুর্গে ফোটাতে হ'তো দু' চারটে ফোকর, এবং সেই ছিদ্র দিয়ে হয়তো বা আসতো আকাশের দু'-এক টুক্‌রো নীলিমা। অবস্থা তা'র ভালো নয় বলে'ই শাস্ত্রানুমোদিত বয়সে বিনাপণে ইন্দ্রাণীর সে বিয়ে দিতে পারলো না।

তার অগণন সন্তানমণ্ডলীর মধ্যে বড়ো মেয়ে এই ইন্দ্রাণী। গায়ের রঙটি মিঠে শ্যামবর্ণ, অপরাজিতার লতার মতো লাবণ্যের একটি মসৃণ ধারা দেহের বেড়া বেয়ে লতিয়ে উঠেছে, মুখের কমনীয়তা উঠেছে বুদ্ধিতে ঝল্‌সে, চোখে ঠিক্‌রে পড়ছে প্রতিভার আলো। তবু সে যখন তেরোয় পা দিলো, রাজীবলোচন তা'র জন্যে লাগ্‌লো পাত্র খুঁজতে, কিন্তু আশ্চর্য্য, অতো ছোট মেয়ে কেউ বিয়ে করতে রাজি হয় না। মেয়েরা না এগোক, ছেলেরা গেছে এগিয়ে: তা'রা বিয়েটাকে ব্যবসার চোখে দেখতে শিখেছে। আশ্চর্য্য, উর্দ্ধতন সপ্তপুরুষ নরকস্থ হ'বার জোগাড়, তবু মেয়ের বয়েস দিনে-দিনে বেড়ে যাচ্ছে দেখেও পাড়াপড়শীরা নিদ্রা-নির্জ্জীব। হাওয়া এসেছে নতুন: সবাইর ঘরের দরজাই সমান এলো। গণ্যমান্যরা বলছেন: অতো ভাবনা কিসের, রাজু। মেয়ে ইস্কুলে পড়ছে, পড়ুক না—আজকালকরা ছোঁড়ারা ঐ তো এখন চায়। কী করবে বলো, সেই সব ধর্ম্মভাব কি আর আছে?

ই ন্দ্রা ণী

ইন্দ্রাণীর এই থার্ডক্লাশ। পিঠের উপর সাপের মতো আঁকাবাঁকা বেণী নাচিয়ে সে ইস্কুলে যায়, তা'র বইয়ের পৃষ্ঠা ও ইস্কুলের দেয়ালের বাইরে যে আর কোনো একটা পৃথিবী থাকতে পারে এ তা'র তখন ধারণায়ই আসতো না। মাঝে-মাঝে সেজেগুঁজে বাড়ির আত্মীয়াদের গয়না গায়ে চাপিয়ে তা'কে যখন পাত্রের অভিভাবকের সামনে এসে দাঁড়াতে হ'তো, তখন তা'র গাল দুটো লজ্জায় হ'তো একটু লালচে, গায়ে লাগতো যৌবনের হাওয়া। তা ছাড়া, আর-আর সময় তা'র একটা রগরঙ্গিণী সাজ: দৌড়ঝাঁপ, খেলাধুলো, বই-খাতা, সুঁই-সেলাই—এই নিয়েই সে মেতে আছে। তা'কে বহন করতে হয় যে একটা নমনীয় শরীর, এবং সেই শরীর সজ্ঞানে বহন করতে যে কী দুঃসহ লজ্জা—এই কথা ইন্দ্রাণীকে কে অতো মনে করিয়ে দেবে? শুধু মনে পড়ে, যখন অমন ঘটা করে' পাত্রের অভিভাবকের সামনে তার শরীরটাকে দিতে হয় বিজ্ঞাপন। নইলে সে খায়-দায়, পড়াশুনো করে, ঘুড়ি কাটা পড়লে সুতো ধরতে ছোটে, জামরুল পাড়তে গাছে উঠতে পর্য্যন্ত কসুর করে না। স্কুলের সমবয়সীদের সঙ্গে কাটে সাঁতার, খেলে হাডু-ডুডু, গার্ল-গাইডের দল পাকায়। এই বয়সেই তা'র মা তাকে কোলে পায় এই কথা ইন্দ্রাণীকে দেখে আজ কে বিশ্বাস করবে? ইন্দ্রাণীর সম্বন্ধে এই কথাটা ভাবতে গেলেও আজকাল কতো অন্যায়, কতো অশ্লীল মনে হয়। সময়ই ধরেছে এখন অন্ত সুর।

বয়েস যদি বা ইন্দ্রাণীর বাড়লো তা'র রঙের পর্দ্দা চড়লো না। তা ছাড়া যতোই সে এক ক্লাশ করে' ডিঙিয়ে যাচ্ছে, রাজীব-

লোচনের মতে, তা'র পাত্রেরো নিশ্চয়ই সমানুপাতে মাইনের সংখ্যার পিছনে একটা করে' শূন্য বাড়ছে। থার্ড ক্লাশে যদি বা একজন কেরানি, সেকেণ্ড ক্লাশে নিশ্চয়ই উকিল; আর যখন এ-বছর সে প্রথম হ'য়ে ফার্ষ্ট ক্লাশে উঠলো তখন একজন ডিপ্‌টি না হ'লে ইন্দ্রাণীকে মানাবে কেন? এ-কথা রাজীবলোচন কেন, তা'র আফিসের সামান্য একটা চাপরাশি পর্য্যন্ত বলে' দিতে পারে। কিন্তু, সংসারে নারীর প্রেম যেখানে পণ্যের সামগ্রী, সেখানে মনের আর-কোনো সুষমা বা লাবণ্যের চাইতে শরীরের চামড়াটাই আগে পড়ে চোখে। তাই বর্ণমালিন্যের ক্ষতিপূরণ বাবদ গলা ছেড়ে তা'রা লম্বা দাম হাঁকে। হাতে পয়সা নেই বলে'ই তো পয়সা খরচ করে' রাজীবলোচন মেয়েকে লেখাপড়া শেখাচ্ছে নি-খরচায় তাকে পাত্রস্থ করবে বলে', কিন্তু চারদিক সে চেয়ে দেখলো মেয়েদের লেখাপড়া শেখানোটা নতুন একটা ফ্যাসান হিসেবেই যা বাঙালি-জীবনে আচম্‌কা এসে গেছে, তা দিয়ে বিয়ের বিশেষ কিছুই সুরাহা হচ্ছে না। বিয়ে ব্যাপারটা আগে যেমনি, তেমনি রয়েছে গতানুগতিক। আজো সেই মেয়ের গায়ের রূপ, বাপের ব্যাঙ্ক-য়্যাকাউণ্ট। রাজীবলোচন বেঁকে দাঁড়ালো, এতোদিন জলের মতো পয়সা ঢেলেও আবার যদি বিয়ের সময় পণ দিতে হয়, তবে এক মেয়ে পার করতেই সে প্রায় পরপারে এসে ঠেকবে। ছেলে হ'লে বরং কিছু ফিরে পাবার প্রত্যাশা থাকে, তা'র পেছনে খরচ করাটা তবু যা-হোক একটা ইন্‌ভেস্‌ট্‌মেণ্ট্‌, কিন্তু মেয়ে হচ্ছে যেন শাঁখের করাত, আসতেও কাটবে, যেতেও কাটবে।

অতএব পুরোদমে ইন্দ্রাণীর পড়া চল্‌লো। এবং বাঙলা দেশের মেয়েদের মধ্যে প্রথম হ'য়ে সে ধূমারোহে ম্যাট্রিক পাশ করলে : বৃত্তি পেয়ে গেলো মাসিক কুড়ি টাকা করে'। বালির বাঁধ দিয়ে কে রোধে তখন আর সমুদ্রের উত্তাল উর্ম্মিলতা? এর উপর আর দশ টাকা পাঠালেই ইন্দ্রাণীর কলেজে পড়া হয়, বোর্ডিঙে থেকে, কল্‌কাতায়। একটা পাড়াগেঁয়ে সহরে থেকেই যখন সে এতো ভালো করতে পেরেছে, তখন বিরাট রাজধানীর ভাবসমৃদ্ধ আবাহাওয়ায় পড়ে' নিশ্চয়ই সে দেবে আরো চমক, আরো চাকচিক্য। তা'র প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্র শুধু এখন আর মেয়েদের ঘিরে সঙ্কীর্ণ হ'য়ে থাকবে না। পাবে সে কল্পনার বিশাল একটা আকাশ—এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্য্যন্ত অবাধে সে পাখা মেলে দেবে, গতির দ্যুতিতে প্রখর পাখা।

মেয়ের যে-মুখে প্রতিভার প্রভা এসে পড়েছে, আত্মবোধের দৃঢ়তা যেখানে রেখায়-রেখায় পরিস্ফুট, সেই মুখ রাজীবলোচনের কাছে স্বপ্নের চেয়েও একটা বড়ো বিস্ময় বলে' মনে হ'লো। অনায়াসে, বলা যেতে পারে খুসি হ'য়েই, সে মত দিলো : ইন্দ্রাণী চলে' এলো কল্‌কাতায়, বেথুনে, হেদোর কাছাকাছি মেয়েদের একটা মেস্‌এ নিলো বাসা। বেণী তখন তা'র খোঁপায় স্তূপীভূত হ'য়ে উঠেছে, দেহের লাবণ্য-তরলিমা তখন ফেনিল তরঙ্গিমায় নিয়েছে রূপান্তর। লালিত্যের বদলে এসেছে লীলা, চাঞ্চল্যের বদলে স্পর্দ্ধিত গাম্ভীর্য্য। শরীরের চেয়ে বড়ো একটা অতীন্দ্রিয় অনুভূতি সে আবিষ্কার করে' বস্‌লো : সে তা'র মন, উদার অন্ধকার আকাশে গণনাতীত বিন্দু-বিন্দু জ্যোতিরুদয়ের

মতো তা'র আশা আর আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন আর বাসনা—তা'র দীপ্তি আর দাহ!

এই মেয়ের মা যে কামাখ্যা, বেচারির তা বিশ্বাস করতে আশ্চর্য্য লাগে। ইন্দ্রাণী যখন এই বয়সেও ছোট খুকির মতো মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে' সহুরে ন্যাকা গলায় খুঁটি-নাটি আবদার করে, তাকে সম্পূর্ণ নিজের অপত্য বলে' আয়ত্ত করতে কেমন তা'র একটু বাধো-বাধো ঠেকে। কিন্তু বাইরে আত্মীয়-অনাত্মীয়ের কাছে চোখের সে এমন একটা তেরছা ভঙ্গি করে, কথায় দেয় এমন সব ঠোকর, যাতে হিংসের জ্বালায় সবাই ওঠে চিড়বিড় করে'। রাজীবলোচনের তো ভীষণ গদ্গদ ভাব। নিজেকে দিয়ে বেশি পড়াশোনা করানো যায় নি, তাই মেয়ের মাঝেই পাচ্ছে সে পরোক্ষ চরিতার্থতা। কামাখ্যার মতো মুখে সে কিছু দেমাক করে' বেড়ায় না, কিন্তু মনের ভিতরে রচনা করে চলে স্বপ্নের উর্ণা। এবার ইন্দ্রাণীর জন্যে নিশ্চয়ই আই-সি-এস্।

কিন্তু বিয়ের কথা ইন্দ্রাণীর কাছে সবিস্তারে পাড়ে এমন সাধ্য কা'র। এবারো সে মেয়েদের মধ্যে সেকেণ্ড হ'য়ে আই-এ পাশ করেছে। এখন সে আর ক্রেতার হাতে বিপণির পণ্য নয়, নিজে সে এখন নিজের মালিক, তা'র জীবনটা কারুর বন্ধকি কারবার নয়, নিজের মূলধন। এখন শরীরের অন্তরালে পেয়েছে সে মনের সন্ধান, নিজের মাঝে ব্যক্তি। এখন তা'র অনেক পথ, অনেক প্রসার। বিয়ে ইন্দ্রাণী এখন করছে না—আপাততো তা'র চেয়ে সম্পাদ্য অনেক বড়ো কাজ তা'র হাতে আছে। বিয়ে

তো সামান্য একটা খুকিও করতে পারে। আগে অন্তত বি-এটা সে পাশ করুক।

তা'র এই দৃঢ় দুর্নমনীয়তাকে যদি কেউ ক্ষয় করতে পারে, তবে-ও সেই সময়। মাসিক দশটাকাও আর রাজীবলোচনকে দিতে হয় না, হস্টেলের কাছাকাছি ইন্দ্রাণী একটা টিউসানি জোগাড় করে নিয়েছে, ত্রিশ টাকা মাইনে। উল্টে বাবাকেই সে টাকা পনেরো সাহায্য করতে পারে। সংসারস্ফীতির সঙ্গে-সঙ্গে দিন-দিন অবস্থা তাঁর যা শোচনীয় হচ্ছে তা'তে ইন্দ্রাণীর এ-দান, বাপের সত্যরক্ষা করতে ইফিজিনিয়ার আত্মোৎসর্গের মতোই সমান গৌরবের। সেকেলের গার্গী-মৈত্রেয়ীও বিদ্যার বিনিময়ে এতোখানি মূল্য পায় নি। অন্তত বাড়ি-ভাড়াটা তো চলে, এবং যে-টাকাটা ইন্দ্রাণীকে মাস-মাস আর দিতে হয় না তা দিয়ে বাজার-খরচের ফর্দ্দটা তো একটু আয়তনে বিস্তৃত হয়। বল্‌তে গেলে, রাজীবলোচনের নাসাগ্র এখন তীক্ষ্ণ, কপাল উদ্ধত ও চোয়ালের হাড় দুটো স্পর্দ্ধায় দৃঢ়তরো হ'য়ে উঠেছে, চোখ ও ঠোঁটের কোণে সমগ্র অকিঞ্চিৎকর পৃথিবীর উপর একটা কঠিন অবজ্ঞা : অর্থাৎ তা'র মতো মাইনের কেরানির মধ্যে কা'র ঘরে এমন দিগ্বিজয়িনী! খরচের কোঠা থেকে ইন্দ্রাণী একেবারে জমার ঘরে চলে' এসেছে: ক্রুসেড্ থেকে ফিরে-আসা জয়ী নাইটের চেয়েও মহত্তরো তা'র আবির্ভাব। কন্যা যে তা'র শরীরের কোনো অতিরিক্ত অর্থে রত্ন হ'তে পারে রাজীবলোচনের তা জান্‌তে বাকি ছিলো। প্রথম সন্তান ছেলে হ'লে সে-ও এমনি পিছে দাঁড়াতো ; এবং বল্‌তে কি, ককখনো

ই ন্দ্রা ণী

ইন্দ্রাণীর মতো এঁতো তাড়াতাড়ি নয়। মিছিমিছি বিয়ের কথা পেড়ে মেয়েকে এখন বিব্রত করে' লাভ নেই: লাভ, রাজীবলোচনের সংসারের লাভ, যদ্দিন বিয়ে তা'র নেহাৎ না হচ্ছে।

তা ছাড়া ঐ কথা ইন্দ্রাণীর সামনে এখন পাড়বে কে? ময়ূরের মতো পেখম মেলে সে আর দাঁড়াবে নাকি ভেবেছ রূপের পরীক্ষা দিতে? খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখাতে তা'র চুলের ঘনতা ও দৈর্ঘ্য, চামড়ার উষ্ণতা ও ঔজ্জ্বল্য। দেবতা প্রজাপতি নয়, দেবতা মীনকেতু। ইন্দ্রাণীর তা'তে, মানে এই বিয়ের ব্যাপারে, নেই এতোটুকু কুৎসিত কৌতূহল, নিজের চারদিকে নেই এক ফোঁটা নিঃসঙ্গতা। তা'কে দেখলে মনে হয় না বিয়ে না করলেই মেয়ে অভিচারিণী হয়, শুভদৃষ্টি করবার জন্যেই তা'রা অহোরাত্র শিবনেত্র হ'য়ে আছে। বরং তাকে দেখলে মনে হয়, বিয়েটাকে সে শরীরের একটা রঙ্গিল অঙ্গরাগ বলে' মানতে চায় না: সে তা'র শরীরের অন্তরালে, আগেই বলেছি, উদ্ভাবন করেছে তা'র আত্মা। সে এখন এমন একজন সম্পূর্ণ ব্যক্তি যে বিয়ের পাত্র ও পানপত্র নিয়েও তা'রই সঙ্গে পরামর্শ করতে হয়। রাজীবলোচনের হাতে কিছু টাকা জমলে তা জমিতে লাগাবে, না, হ্যাণ্ডনোটে ধার দেবে, সে বিষয়েও বুদ্ধি দেয় এই ইন্দ্রাণীই। ইন্দ্রাণীর সঙ্কেত ছাড়া রাজীবলোচন আজকাল আর এক পা-ও চলতে চায় না।

যদি সে কখনো মেয়ের পিঠে মৃদু-মৃদু হাত বুলুতে-বুলুতে জিগ্‌গেস করে: আর কতো পড়বি, মা? এবার জাঁকজমক করে' তোর বিয়ের একটা জোগাড় করি।

ই ন্দ্রা ণী

ইন্দ্রাণী তখন ঠোঁটের উপর পাৎলা একটি হাসির পাপড়ি মেলে বলে: জোগাড় করে' ও-জিনিস মেলে না, বাবা। বলে'ই সে শরীরের রেখাগুলি চঞ্চলতায় উচ্চকিত করে' সেখান থেকে' চলে যায়।

তা'র ঐ ত্বরান্বিত অন্তর্ধানের অর্থ উনবিংশ শতাব্দীর ভঙ্গুর কৌমার-ব্রীড়া নয়; অর্থ, হাতে তা'র এখন অনেক জরুরি কাজ, বিয়ের জোগাড় যদি করতেই হয় কখনো, সে একাই যথেষ্ট।

অনুরোধ করলে তো এই, জোর করা তো ভয়াবহ দুঃস্বপ্নেরো অতীত। জোর করবে রাজীবলোচন আর কা'কে? ইন্দ্রাণী পেয়ে গেছে তা'র মেরুদণ্ড, সকল জোরের বিরুদ্ধে প্রকাণ্ড প্রতিষেধক। ঐ অস্ত্রের সঙ্গে যুঝবে এমন সাধ্য কা'র? ইন্দ্রাণী পেয়ে গেছে তা'র পায়ের নিচে মাটির কঠিন আশ্রয়, কে আর নিয়ে আসবে তাকে মোহের মরুভূমিতে। সময় যদি তা'র এখনো না হ'য়ে থাকে, রাজীবলোচন এই সময়ের হাতেই সুতো ছেড়ে দেবে।

তিন

ইংরিজিতে ফার্স্ট-ক্লাশ অনার্স নিয়ে ইন্দ্রাণী বি-এ পাশ করলো।

একপাত ঝক্‌ঝকে ইস্পাতের মতো উজ্জ্বল ও ধারালো ইন্দ্রাণীর দেহ যেন চঞ্চলতার লতা। তা'র চলায়-বলায় হাসিতে-গাম্ভীর্য্যে বিচ্ছুরিত হচ্ছে বুদ্ধি, তেজোময় ব্যক্তিত্ব। নাকের উপর সোনার হাল্‌কা চশমাটি চোখে এনেছে দৃষ্টির শাণিত সূক্ষ্মতা। তা'র ক্রমক্ষীণায়মান আঙুলের অগ্রভাগে শাণিত ব্যগ্রতা : তা'র নিটোল চিবুকে গভীর উপলব্ধি। গায়ে তা'র মুক্তির ঢেউ, তুই পায়ে অবারিত পথলিপ্সা। অথচ এ-শোভা তা'র প্রসাধনে সমৃদ্ধ নয়, পরিপুষ্ট নয় বাহ্যিক কৃত্রিম কোনো সৌন্দর্য্যের অনুশীলনে : এ শোভা তা'র ব্যক্তিত্বের বিকীরণ, তা'র অস্তিত্বের বর্ণচ্ছটা। কস্‌মেটিক্‌স্ নয়, ইস্‌থেটিক্‌স্‌ই হচ্ছে ইন্দ্রাণীর বিষয়। বেশবাস যা-বা কিছু সে করে, স্বল্প পরিচ্ছন্ন বেশবাস—তা তা'র আত্মার আনন্দকে প্রতিমূর্ত্ত করতে, দৃষ্টি-বিহারী পুরুষকে মুগ্ধ করতে নয়। নয় সে রঙচঙে-পাখা-মেলা ফুরফুরে প্রজাপতি, পাখায় নেই তা'র ফুলের সোনালি রেণু মাখা : দস্তুরমতো সে সবলবর্দ্ধনা, তুই বাহুতে তা'র পেশল বলিষ্ঠতা।

প্রজাপতি ছেড়ে বন্য একটা চিতাবাঘের সঙ্গে তা'র তুলনা করা যায়। শরীরে তা'র সেই পিচ্ছিল ক্ষিপ্রতা, সেই শক্তির বিদ্যুদ্দীপ্তি। স্বাস্থ্য অর্থ দেহের মেদবিস্ফার নয়, নয় কতোগুলি রাশীভূত মাংস : ইন্দ্রাণীর হচ্ছে দৃঢ়তার লাবণ্য, শক্তির অমিতোচ্ছ্বাস। কৈশোরকাল থেকে সে রূপচর্চ্চা না করে' করেছে বলানুশীলন, চামড়ার জৌলুস না বাড়িয়ে রক্তের গাঢ়তা। ব্যায়াম তা'র শরীরে এনেছে প্রকৃত অনুপাত, অবয়বের সংস্থানে এনেছে পরিচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য। স্বয়ম্ভূতা সমুদ্রোত্থিতা আফ্রোদিতের চেয়ে মৃগয়া-বিহারিণী আর্টিমিস্ তা'র বড়ো দেবী। তা'র কাছে শরীর বিলাস নয়, বিস্ময়—একটা মাত্র জটিল ধারাবাহিক যন্ত্র নয়, কেননা যন্ত্রে জন্ম পায় না শেক্‌স্‌পিয়ারের কবিতা, দা-ভিঞ্চির ছবি। দেহ তা'র কাছে একটা মদির অনুপ্রাণনা,—এবং দেহময় এই উজ্জ্বল উৎসাহই তা'র আসল সৌন্দর্য্য। দেহের এই দৃঢ়তা তা'র মনেও হয়েছে সংক্রামিত, এবং মানুষের মন অরণ্যের চেয়েও গহন, আকাশের চেয়েও গভীর।

এবার, বি-এ পাশ করে', ইন্দ্রাণী নতুন কী অসাধ্যসাধন করে' বসে, সবাই উদ্‌গ্রীব হ'য়ে রইলো। হয়তো পড়তে চাইবে এম-এ, কিম্বা নিতে ছুটবে কোনো মাষ্টারি।

ইন্দ্রাণী নিভৃতে রাজীবলোচনের কাছে গিয়ে সরাসরি বলে' বসলো : বাবা, এবার আমি বিয়ে করবো।

স্পষ্ট, একটু-বা রূঢ় শোনালো, কিন্তু ইন্দ্রাণীর বলার ভঙ্গির মধ্যে এতোটুকু নির্লজ্জতা নেই। মেয়ে নিজে থেকে সরাসরি বিয়ের কথা পাড়ছে ব্যাপারটায় সামাজিক অসৌজন্য একটু ছিলো

হয়তো, কিন্তু সত্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ভয়ে ভেঙে পড়বার মেয়ে ইন্দ্রাণী নয়। বিয়ে যখন করবেই মনে করেছে, তখন মুখের উপর মনের কথা বলে' ফেলাই সভ্যতা। সীতাকে বনবাসে পাঠাতে হ'বে, অথচ তা লক্ষ্মণের জবানিতে, সেই সেকেলের ভদ্র দৌর্ব্বল্যের সে পক্ষপাতী নয়।

রাজীবলোচন এখুনিই তা'র প্রত্যাশা করছিলো না, কিন্তু খুসি হ'য়ে উঠলো অপরিমিত। বল্লে,—তোমার এতোদিনে বিয়ের যে মত হ'লো সেটা ভগবানের আশীর্ব্বাদ বলতে হ'বে। হাতে এখনো আমার দু' চারটে ভালো পাত্র আছে, তা'র কথা উঠতে লাগলো রসালো হ'য়ে: তুমি একটিবার মত দিলেই হয়। করুণাবাবু তো তাঁর ছেলের জন্যে সেই কবে থেকে এখানে ঝোলাঝুলি করছেন, রেঙ্গুনে ফরেষ্ট-ডিপার্টমেণ্টে তিনশো টাকা মাইনের চাকরি করছে। অতো দূরে তোমাকে যেতে দিতে মন সরবে না, তা, হাতের কাছে আছে শম্ভুবাবুর ভাই-পো। জার্ম্মানি থেকে এসে কল্‌কাতায় ছাপা-খানার কলকব্জার কী ফ্যালাও কারবার দিয়েছে— শম্ভুবাবুরা লাখী লোক। কা'কে তোমার পছন্দ হয় এদের মধ্যে? পাটনায় উমাচরণবাবুর ছেলে য্যাসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জন, সাসারামে হীরালালবাবুর নাতি ইন্‌কাম-ট্যাক্স-অফিসার। আজই বলো, আজই তাঁদের চিঠি লিখে দি, সব যুগ্যি ছেলে এঁরা।

ঠোঁট কাঁপিয়ে অল্প একটু হেসে ইন্দ্রাণী বল্লে,—তোমার ব্যস্ত হ'তে হ'বে না, বাবা, পাত্র আমি ঠিক করেছি।

ইন্দ্রাণী

রাজীবলোচন এতোটাও কখনো আশা করে নি। চোখের তারা দুটো স্থির, সে নির্ব্বোধের মতো প্রশ্ন করলে : পাত্র ঠিক করেছ মানে?

—মানে, ভাগ্য ঠিক করে' দিয়েছে, ইন্দ্রাণী সসঙ্কোচে বল্‌লে, —শিগ্‌গিরই আমরা বিয়ে করতে চাই, তোমার মত নিতে এসেছি।

খাটের বাজুটা ধরে' ফেলে রাজীবলোচন নিজেকে সাম্‌লালো : পাত্রটি কে? কী করে?

—বিশেষ কিছুই করেন না, ইন্দ্রাণী বাপের মুখের দিকে চেয়ে একটু পীড়িত কণ্ঠেই বললে,—এম-এ পাশ করে' সম্প্রতি চুপচাপ বসে' আছেন, পরে কিছু একটা করবেন নিশ্চয়ই।

রাজীবলোচন রাগে মুখ বেঁকিয়ে উঠলো : অসম্ভব। শেষকালে এমন পাত্র তোমার মনে ধরলো?

ইন্দ্রানীর কণ্ঠস্বর নির্ম্মম, নির্ভয় : কী করবো, বাবা, উপায় নেই।

—উপায় নেই মানে? তুমি কি ষ্টাম্পের ওপর নাম দস্তখৎ করে' দিয়েছ নাকি?

বাপের অদ্ভুত উপমা শুনে ইন্দ্রাণীর ঠোঁটে হাসি ফুটলো : তা'র চেয়েও বেশি।

রাগে রাজীবলোচন একটু-একটু তোৎলাতে স্থুরু করেছে : শেষকালে তুমি এমন একটা বেকার, অপদার্থ লোক বাছলে? এক পয়সা কামাবার মুরোদ নেই, সে তোমার মতো মেয়েকে বিয়ে করবে?

ইন্দ্রাণী তা'র শাড়ির পাড়টা সূক্ষ্ম চোখে পর্য্যবেক্ষণ করতে-করতে বললে,—কী পরিমাণ সে টাকা রোজগার করে সেই দিকে দৃষ্টি রেখে তা'কে বরণ করি নি। আর্থিক প্রয়োজনের দিক থেকেই সব জিনিসের সৌন্দর্য্য আমরা বিচার করি না, বাবা।

রাজীবলোচন স্তম্ভিত হ'য়ে গেলো। গলা চিরে' তা'র শব্দ বেরুলো: এরি জন্যে তোমাকে আমি এতোদিন লেখাপড়া শিখিয়েছি?

কাণায়-কাণায় মিনতিভরা পরিপূর্ণ দু'টি চোখ তুলে ইন্দ্রাণী বললে,—এ-প্রশ্ন আমিও তোমাকে করতে পারতাম, বাবা। আমাকে এতোদিন তুমি লেখাপড়া শেখালে, এতো দিলে স্বাধীনতা, আর আমি তা'র ব্যবহার করতে পিছিয়ে থাকবো? হোক ভুল, তবু স্বাধীনতাটা তো আমার।

—কিন্তু, এম-এ পাশ-করা একটা আস্ত গণ্ডমূর্খ, সে তোমাকে খাওয়াবে কী?

—সে খাওয়াতে না পারুক, আমি পারবো। আমি কি এমনি অকর্ম্মণ্য?

রাজীবলোচন প্রশ্ন করলো: লোকটার নাম?

আলগোছে চোখের পাতা দু'টি নামিয়ে ইন্দ্রাণী বললে,—সুদর্শন সেন।

—সেন? রাজীবলোচন প্রায় চীৎকার করে' উঠলো: আর তুমি?

—ব্রাহ্মণ, চাটুজ্জে।

—তুমি—তুমি ওকে বিয়ে করবে?

—হ্যাঁ, তাই তো ঠিক করেছি। মাত্র একটা জাতের বাধা আমাদের আলাদা ক'রে' দেবে এতোটা ভাবপ্রবণতা কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারি না। ইন্দ্রাণী কঠোর একটা ভঙ্গি করলে।

রাজীবলোচন একেবারে ম্লান হ'য়ে গেলো। শুক্‌নো গলায় বল্‌লে,—তা হ'লে তুমি আর হিন্দু থাকছো না?

—একশো বার থাকছি। মাত্র একটা প্রথার ওপর হিন্দুত্ব দাঁড়িয়ে আছে নাকি? ইন্দ্রাণী দীপ্তকণ্ঠে বললে,—হিন্দুধর্ম্মের মতো এতো উদাসীন, এতো উদার ধর্ম্ম আর কোথায় আছে। স্বয়ম্বৃতা হ'বার চমৎকার অনুষ্ঠান এই হিন্দুত্বেরই সাবেক আমদানি, বাবা। আমিও সেই হিন্দুর মেয়ে।

—যাক্, তোমার মুখে আর পুরাণের আলোচনা শুনতে চাই না।

—দরকার হ'লে আমাকে তোমরা ঝুড়ি-ঝুড়ি শোনাতে পারো। ইন্দ্রাণী তরলকণ্ঠে বলতে লাগলো: দিকে-দিকে সীতা-সাবিত্রীর এতো সব পুণ্যকথা শুনতে পাই, অথচ প্রাতঃ-স্মরণীয়াদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে গেলেই পৃথিবী গেলো রসাতলে। আমি যদি সাবিত্রীর মতো বর মনোনয়ন করি, তবে আমাকে কেউ ক্ষমা করবে না: যদি সীতার মতো রুগ্ন শ্বশুর-শাশুড়ি ফেলে স্বামীর সঙ্গে দেশভ্রমণে যাই, তবে তো আর কথাই নেই—দেশের হিন্দু দৈনিক কাগজগুলো আমার আছশ্রাদ্ধ করবে। বলে', কথা শেষ হ'বার সঙ্গে-সঙ্গে ইন্দ্রাণী শব্দ করে' হেসে উঠলো।

—সে-যুগের সাফাই গাইতে এসো না। রাজীবলোচন শ্রান্ত, বিরক্ত মুখে বল্‌লে,—সাবিত্রীর কীর্ত্তিটা একবার মনে করে' দেখো।

—দেখেছি। কিন্তু তেমন মহীয়সী এ-যুগেও অচল নয়, বাবা। ইন্দ্রাণী হেসে ফেল্‌লো: যমরাজ সশরীরে আর দেখা দেন না, নইলে পলিমিক্‌স্‌এ কারসাজি দেখিয়ে অনেকেই মরা স্বামী জীইয়ে তুলতে পারতো। তা ছাড়া কী পরিমাণ সেবা-শুশ্রূষা করে' বাঙলার গৃহলক্ষ্মীরা তাঁদের মুমূর্ষু স্বামীকে বাঁচান তা'র ঠিকমতো পাব্‌লিসিটি দিতে পারলে তাঁরা সাবিত্রীর চেয়ে কম যেতেন না কখনো।

—কিন্তু, রাজীবলোচন অস্থির হ'য়ে উঠলো: কিন্তু, স্বজাতে হিন্দুমতে বিয়ে করতে তোমার আপত্তি কী?

—আমার কিছুই আপত্তি ছিলো না, বাবা, কিন্তু ঈশ্বর এ-ক্ষেত্রে বিমুখ। ইন্দ্রাণী সামান্য গম্ভীর হ'লো: মতের মধ্যে কী আছে, কতোগুলি কথার খোলসের মধ্যে? আমাদের মনের দিক থেকে তা একেবারে মিথ্যে, এতো মিথ্যে যে সমস্ত শরীরে নিদারুণ ঘৃণা ধরে' যায়। এই বেশ, বিয়ের নামে একটা অতিকায় অপব্যয় নয়, কতোগুলি অর্থহীন বাগাড়ম্বর নয়, দু'জন সাক্ষী নিয়ে রেজিষ্ট্রারের কাছে গিয়ে ফি জমা দিয়ে সম্বন্ধটা পাকা করে' আসা।

পেছন থেকে পিঠের ওপর আমূল একটা ছুরি বসিয়ে দিলেও রাজীবলোচনের মুখ এতো বিকৃত হ'তো না: রেজেষ্টারি করে'? শেষে তুমি রেজেষ্টারি করে' বিয়ে করবে?

—আইনের গোলমাল না থাকলে তারো দরকার ছিলো না। ইন্দ্রাণীর কপালে নীল দুটো শির ফুলে' উঠলো: হিন্দু-বিয়ের চেয়ে তা অনেক সভ্য, অনেক যুক্তিসঙ্গত। স্যাক্রামেণ্টের ফাঁস জড়িয়ে যাবজ্জীবন নির্ব্বাসন নয়, এখানে আগে-পিছে দু'দিক থেকেই দরজা খোলা আছে। নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধে দাসত্বের জাঁতাকলে তিলে-তিলে চিরকাল নিজেকে ক্ষয় করা নয়, চারদিকে রয়েছে মুক্তির আবহাওয়া।

—তুমি এই বিয়ে করে' আবার এ-বন্ধন ছিন্ন করবে নাকি?

—দরকার হ'লে করবার আমার স্বাধীনতা থাকবে। কিন্তু সে তো অনেক—অনেক দূরের কথা। ইন্দ্রাণী একটু এগিয়ে এলো: আমি যদি এ-বিয়েতে সুখী হ'বো মনে করি, তবে তোমার আর কিসের আপত্তি বলো?

রাজীবলোচন মেয়ের ছোঁয়া বাঁচিয়ে লাফিয়ে উঠলো: তুমি এই বিয়েতে সুখী হ'বো মনে করো?

হাতের দুর্ব্বল একটা ভঙ্গি করে' ইন্দ্রাণী বল্‌লে,—তুমি আশীর্ব্বাদ করলে নিশ্চয়ই হ'বো, বাবা।

—ঐ গর্দ্দভ এম-এ পাশ-করা নিষ্কর্ম্মা ছেলেটাকে বিয়ে করে'?

—কে জানে! ইন্দ্রাণী নিচের ঠোঁট উল্‌টোল: তোমার ঐ-সব মার্কা-মারা ধুরন্ধর পাত্রদের কারু সঙ্গে বিয়ে হ'লেই সার্থক হ'তাম তারো বা ঠিক কী। সবই chance—বিয়েটা আগাগোড়াই একটা লটারি। আর আমার তো মনে হয় বাবা, সংসারে এই chanceই একমাত্র অভ্রান্ত। কোনো আকস্মিক ঘটনায় যা হাতের কাছে আসে, ধরে'-বেঁধে ছক্‌ কেটে কোনো

জিনিসের পাওয়ার চেয়ে তা অনেক সত্য। গ্রীকরা তো শুনেছি 'টস্' করে' তাদের রাজকর্ম্মচারী নির্ব্বাচন করতো, তাই বলে' তা'দের কম সুশাসন ছিলো না।

রাজীবলোচন বল্‌লে,—ছেলের আর কে আছে ?

—মা আর দুই দাদা আছেন শুনেছি, দু'জনেই রোজগার করেন। তবে তাঁদের আয়-ব্যয়ের ঠিক হিসেব জানি না। ইন্দ্রাণী আবার এক পা এগিয়ে এলো : যা হ'বার তা হ'বে, জীবন নিয়ে একটু য়্যাডভেঞ্চারই যদি না করলাম তো তা'র আর স্বাদ কী বলো। সুখী হওয়া বাবা, আমার নিজের হাতে, আমার হাতের বাইরে নয়। তুমি আমাকে আশীর্ব্বাদ করো—

—আশীর্ব্বাদ! রাজীবলোচন পিছিয়ে গেলো: তোমার কাছে আমাদের আশীর্ব্বাদেরই যদি দাম থাকতো, তবে এমন একটা কুৎসিত কাণ্ড করে' বসতে না। বিয়ে তোমাদের কবে হচ্ছে ?

—যে কোনোদিন হ'তে পারে, সব দিনই আমার কাছে সমান শুভ। ব্যথায় উজ্জ্বল দুই চোখ তুলে ইন্দ্রাণী বল্‌লে,— কিন্তু সামান্য একটা মত, তুচ্ছ একটা প্রথার জন্যে আমার এতো বড়ো একটা উপলব্ধিকে তুমি কুৎসিত বলবে ?

—তা'র চেয়ে আরো কটু কথা বলা উচিত ছিলো। সগর্জ্জনে রাজীবলোচন বল্‌লে: এখন তুমি আমার কাছ থেকে চলে' যেতে পারো—যেখানে তোমার খুসি, যেখানে তোমার সেই রেজেষ্ট্রি আফিস্। লেখাপড়া শিখে তুমি যে এমন একটি আস্ত মেমসাহেব হয়েছ তা আমার জানা ছিলো না। তখন হাত-

পা বেঁধে কেন যে তোমাকে জলে ফেলে দিই নি তারি জন্যে আমার এখন শোক করতে ইচ্ছে হচ্ছে! যাও, রাজীবলোচন দরজার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলো: হিন্দু মেয়ের মতো বাপের আর আশীর্ব্বাদ কুড়োতে হ'বে না, রেজিষ্ট্রার-সাহেব তোমাকে আশীর্ব্বাদ করবার জন্যে হাত তুলে বসে' আছে।

প্রায় কাঁদ-কাঁদ গলায় ইন্দ্রাণী বল্‌লে,—তা'র দরকার ছিলো না, বাবা। তোমার আশীর্ব্বাদ পেলেও আমাকে যেতে হ'তো।

—তাই যাও, বব্ করে', গাউন পরে', গালে-ঠোঁটে চূণকালি মেখে বিলিতি বাঁদর সাজো গে, যাও। আমাদের মুখোজ্জ্বল করতে দয়া করে' তোমার ও-মুখ আর আমাদের সাম্‌নে বা'র করো না। রাজীবলোচন অন্তঃপুরের দিকে পা বাড়ালো; চীৎকার করে' উঠলো: মেয়েদের আজই—আজই ইস্কুল থেকে নাম কাটিয়ে আনো, আমার ঢের শিক্ষা হয়েছে, সোনার পাথরের বাটিতে ঢের রাজভোগ খেয়েছি—

বাপের সঙ্গে তবু যা-হোক্ একটা বিস্তৃত আলোচনা করা গিয়েছিলো, কিন্তু কামাখ্যা দেবীর কান্না ছাড়া আর কোনো কথা নেই।

—কেন, কেন তুই এই বিয়ে পছন্দ করতে গেলি?

—তাতে হয়েছে কী, মা? আমি তোমাদের সেই মেয়ে, চিরকাল সেই ইন্দ্রাণীই থাকবো। ইন্দ্রাণী মা'র শোকাকুল মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে' বললে,—তোমাদের সুখী করা আমার কর্ত্তব্য, আর আমাকে সুখী দেখা তোমাদের কর্ত্তব্য নয়?

—এরি জন্যে তোকে আমরা লেখাপড়া শিখিয়েছিলাম?

—ঠিক এরি জন্যে, মা। স্বাতন্ত্র্য শিখতে, নিজের পায়ের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়াতে।

—কিন্তু এখনো সময় আছে, এ-বিয়ে তুই ভেঙে দে।

—এখন কেন, সে-স্বাধীনতা আমার চিরকাল থাকবে, মা। মিছিমিছি কেন তুমি চোখের জল ফেলবে? ইন্দ্রাণী বল্‌লে,—আমি যখন মা হ'বো, তখন আমার মেয়েকে—আমার মেয়ে যদি এমন গৌরবের অধিকারিণী হয়—আমার মেয়েকে নিজহাতে ইন্দ্রাণীর মতো সাজিয়ে দেবো, দেখো। তুমি ওঠো। তোমার মেয়ের বিয়ে, আর তুমি উলু দিচ্ছ না? এ তুমি কেমন ধারা, মা? ইন্দ্রাণী দুই হাতে মা'র গলা জড়িয়ে ধরলো: এই দেখ আমি, তোমার ইন্দ্রাণী, তোমার স্বর্গের ইন্দ্রাণীর চাইতে আমার আজ বেশি ঐশ্বর্য্য।

চার

সুদর্শনের সঙ্গে ইন্দ্রাণীর প্রথম আলাপ তা'দের এই হস্‌টেলেই, আই-এ দেবার যখন তা'র মোটে মাসখানেক বাকি। সুদর্শন তখন ফিফ্‌থ্‌ ইয়ারে, হিস্‌ট্রিতে। জয়ন্তী—সম্পর্কের লতায়-পাতায় কি-রকম তা'র বোন হয়—পড়ে ইন্দ্রাণীর সঙ্গে, থাকেও এই হস্‌টেলে—সুদর্শন তা'র সঙ্গে কালে-ভদ্রে দেখা করতে আস্‌তো। ভিজিটার্স-রুম্‌টা আয়তনে ছোট ও বসবার চেয়ারের সংখ্যা নিতান্ত পরিমিত বলে' হস্‌টেলের সমস্ত মেয়ের জন্যে সপ্তাহে কোনো একটা বাঁধাধরা ভিজিটার্স-ডে নির্দ্দেশ করে' রাখা সম্ভব ছিলো না। মেয়েরা তাই ছোট-ছোট দল পাকিয়ে নিজেদের জন্যে আলাদা-আলাদা দিন ঠিক করে' রাখতো—সপ্তাহে দু'দিন করে'। একেক দলে চার-পাঁচ জনের বেশি নয় অবিশ্যি। জয়ন্তীদের গ্রুপটার যদি হয় মঙ্গলবার আর শুক্রবার, চামেলিদের সোমবার আর বেস্পতিবার—ঐ দু'দিন ছাড়া দু' দলের ভিজিটার্সদের আসতে বারণ। অন্যান্য দিন বাইরে বেড়াতে যাবার অবিশ্যি বাধা ছিলো না, তারপর শনিবার বিকেলে যার-যার আত্মীয়-স্বজনের বাড়ি যাবারো একটা ফ্যাসান

ছিলো চল্‌তি। ফিরতে অবিশ্যি সেই সোমবার সকাল। হস্‌টেলে একজন মেট্রন বা মাসিমা আছেন বটে নামমাত্র, কিন্তু সমস্ত দেখাশোনা ও খবরদারি করার ভার মেয়েদের মধ্যেই ভাগ করে' দেয়া: খানাপিনা যেমন সস্তা, কড়াক্কড়িও তেমনি নেই বললেই চলে। মেয়েরা যে-যার মালিক, যে-যার নমুনা। ব্যবসায় যেমন সাধুতা করতে হয় সিদ্ধিলাভের সহজ উপায় ভেবে, তেমনি জীবনেও একটা নিয়ম রাখতে হয় জীবনকে ভোগ করবার বেশি স্থবিধে হয় বলে'। নিয়মটা এদের কাছে নিগড় হ'য়ে ওঠেনি, নির্ম্মোকের মতো চলে তা'র ক্রমান্বিত পরিবর্ত্তন। তাই এদের চেহারায় যেমন ছিল খুসির টাট্‌কা একটা জৌলুস, ব্যবহারেও ছিলো একটা সতেজ সরলতা। যেমন দাপটে তা'রা কথা কয় ও হাসে, চেঁচামিচি ও ছুটোছুটি করে, রাস্তা দিয়ে যেতে-যেতে কারুর মনে হয় না যে এটা ছাত্রীদের একটা হস্‌টেল, মনে হয় বিরাট একটা একান্নবর্ত্তী পরিবারের এতোগুলি কুমারী অন্তঃপুরিকা। উপরে-নিচে, সিঁড়িতে-বারান্দায়, রান্নাঘরে-বাথ্‌রুমে লেগেই আছে তা'দের সোরগোল আর হুটোপুটি: এ ওর রুটি চুরি করে' খায়, ও এর শাড়ি আর গয়না পরে' কলেজ করে। একজনের খামের চিঠি পঁচিশজনের চোখের কাছে আব্রু হারায়। হস্‌টেলে বসেছে যেন এক ছোটখাটো কমিউনিজ্‌ম্‌, এমন কিছু সুখ কেউ ভোগ করতে পারবে না যা থাকবে কারুর একলার এলেকায়, সকলকে ভাগ দেয়া না সম্ভব হোক অন্তত ঘ্রাণে অর্দ্ধভোজনের ব্যবস্থা করে' দিতে হ'বে। তাই এদের মাঝে নেই কিছু স্তব্ধ ও সুপ্ত, নেই কিছু গূঢ় ও

গোপন। কা'র বাড়িতে ক'টা জ্বলে উনুন, দু' বেলা ক'খানা পড়ে পাত—সমস্ত হাঁড়ির খবর তা'দের মুখস্ত, এমন-কি কোনো ভিজিটার যখন সদর দরজায় দাঁড়িয়ে হাঁক দেয় : দরোয়ান, তখন মাত্র গলার আওয়াজ পেয়ে তা'রা বলে' দিতে পারে কা'র কাছে কোন দাদা বা মামা বা জামাইবাবু এসেছেন। সবাই মিলে পেতেছে একটা কৌমার-'কলোনি' : এক তোড়ায় গুচ্ছীকৃত কতোগুলি বিচিত্রিত ফুল, পাপড়ির বিকাশোন্মুখতায়, রঙে-রেখায় যা এদের একটু তারতম্য—কেউ বা গাঢ়, কেউ বা পাৎলা ; কেউ বা মদির, কেউ বা মিঠে—তফাৎটা বিশেষ কিছু চোখে পড়ে না।

ইন্দ্রাণী ছিলো জয়ন্তীর গ্রুপে—যদিও কল্‌কাতায় তা'র কেউ আত্মীয় নেই। ভিজিটার্স-লিষ্ট্‌টা তার শূন্য, কোনো নাম দেয়া হয় নি। বরাদ্দ দিনে সে-ই বেরোয় সহর ঘুরতে, বাজার করতে, পাড়া-বেপাড়া বেড়িয়ে আস্‌তে : কেউ যদি-বা তা'র সঙ্গে দেখা করতে আসে, নেহাৎ সে কলেজের কোনো ছোক্‌রা মাষ্টার (নোটের খাতা দিতে অগ্রিম), বা দৈনিক ইংরিজি কাগজের কোনো সাব্‌-এডিটার (তা'দের যুগনারীসমিতির রিপোর্ট নিতে)। এমন কেউ আসে না যার সঙ্গে, দুই চেয়ারের মাঝে টেব্‌লের সামান্য একটা কাষ্ঠ ব্যবধান রেখে, বসে'-বসে' গলা ছেড়ে গল্প করা যায়। এমন কেউ নেই যার জন্যে সপ্তাহে অন্তত একটা দিনও প্রতীক্ষায় সে থেকে-থেকে উচ্চকিত হ'তে পারে।

সুদর্শনের কথা জয়ন্তীর মুখে সে এতো শুনেছে যে তা'র মাঝে-মাঝে সন্দেহ হয়েছে জয়ন্তী তাকে দস্তুরমতো ভালোবাসে

কি না। তা হয়তো-বা একটু বাসে, তেমন গভীর কিছু হ'লে বলতে সে বাধ্য থাক্‌তো নিশ্চয়, কিন্তু সুদর্শনকে স্বচক্ষে সেদিন দেখে তা'র এ-ই ভেবেই আশ্বস্তি হ'লো যে হিন্দুমতে বিয়েটা তা'দের অচল। আর যে-ভালোবাসা বিয়েতে সম্পূর্ণতা পায় না তা'তে ইন্দ্রাণীর সায় নেই : এ যেন কলের জলে গঙ্গাস্নান করা, টাইম-টেব্‌ল্ পড়ে' বিদেশ বেড়ানো। দেহ আর মনে এমন নিকট সম্বন্ধ, যেমন পেয়ালা ও তা'র হাতলের—হাতল বাদ দিয়ে গরম পেয়ালায় কে চুমুক দিতে যাবে?

ব্যাপারটা ঘটেছিলো এমনি।

ইণ্টারমিডিয়েট্ পরীক্ষা তখন আসন্ন, বিকেলের দিকে পঠন-ক্লান্ত জীর্ণ শরীরটাকে একটু হাওয়া খাইয়ে আনা দরকার। অথচ মন এখন উৎকণ্ঠায় এতো অবসন্ন যে নিজে থেকে মৌলিক কোনো গবেষণা করে' যেখানে-খুসি বেরুনো চলে না, শুধু কারুর সস্নেহ কর্ত্তৃত্বের উপর নির্ভর করে' একটু ফাঁকায় এসে বিশ্রাম করতে ইচ্ছা করে। তেমনি এক সন্ধ্যায় জয়ন্তী তা'র গায়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো : চোখের আর মাথা খাস্ নি, ইন্দ্‌রি, ওঠ্, বেড়াতে চল্।

ইন্দ্রাণী শুক্‌নো, শ্রান্ত চোখ তুলে বল্‌লে,—কোথায়? আমার কিন্তু ভাই আজ বিকেলেই 'হাইপথেসিস্'টা মুখস্ত করে' ফেল্‌বার কথা।

—থাক্, মুখস্ত না করলেও তুই ফার্স্ট্ হ'বি। জয়ন্তী গলা নামিয়ে বল্‌লে,—দর্শন-দা আমাকে বেড়াতে নিয়ে যেতে চাইছেন। তুই-ও চল্, বাড়িটা একবার বোঁ করে' ঘুরে

আসি। একটু ঘুরে এলে আবার খানিকটা পড়বার ইম্‌পিটাস্‌ পাবি' খন।

ইন্দ্রাণী আবিষ্ট চোখে বল্‌লে,—বা, তোদের সঙ্গে আমি কেন যাবো?

—এই ছাখ্‌ দর্শন-দার মা, আমার পিসিমা, চিঠিতে তোকে যেতে লিখে দিয়েছেন। বিকেলে দু'ঘণ্টা ঘুরে এলে তোর লজিকের বদহজম হ'বে না। নে, ওঠ্‌, সবাইর সঙ্গে বেশ আলাপ হ'য়ে যাবে। জয়ন্তী হাস্‌লে : বলে'-বলে' তোকে আমি এতো ফুলিয়েছি যে সবাইকে না দেখাতে পারলে আমার আর মুখ থাকে না। চোখে-মুখে জল দিয়ে নে, দর্শন-দাকে বলে' দিলাম তুই যাবি। তুই যাবি শুনে দর্শন-দা **straight** একটা ট্যাক্সি আনতে গেছে।

পরিচয়ের সেই প্রথম সন্ধ্যাটা ইন্দ্রাণীর কী চমৎকার কেটেছিলো। মাঝারি মধ্যবিত্ত একটি পরিবার, অনেকগুলি শিশুর বসেছে মেলা, ঘরে-দুয়ারে লোকজনের আচারে-চেহারায় বিশিষ্ট একটি সম্ভ্রান্ততার ছাপ। তাকে দেখে সুদর্শনের মা সৌদামিনী গদ্গদ, বৌদিদিরা নীরদা আর নিভা একেবারে বিহ্বল। তুষারচূড়া থেকে যেন পার্ব্বতী নেমে এসেছে : উপন্যাসের পৃষ্ঠা থেকে নতুন নায়িকা। সাদাসিধে পোষাকে ও সহজ কথাবার্ত্তায় সে একেবারে ঘরের মেয়ে। স্তুতিতে দিঙ্মণ্ডল মুখর হ'য়ে উঠলো। থালা ভরে' খেতে দিলো, ইন্দ্রাণী যদি কিছু না মনে করে—সৌদামিনী তা'কে একখানা নতুন শাড়ি দিয়ে প্রণামের বিনিময়ে আশীর্ব্বাদ করলেন। বিনিময়ে ইন্দ্রাণী গোটা

কয়েক গান শোনালো, প্রচুর খেল্লো আর উচ্চগ্রামে খিলখিল করে' হাসলো। সবাইর সঙ্গে মিশে গেলো সমতল জায়গায় জলের মতো তরল হ'য়ে। এমন মেয়ে আর হ'তে নেই।

এ-ঘর ও-ঘর করতে-করতে জয়ন্তীর সঙ্গে তা'র দর্শন-দার পড়ার ঘরেও সে ঢুকেছিলো বৈ কি। বইয়ের পাহাড়ে দেয়াল পড়েছে ঢাকা, মেঝের উপর চেয়ার-টেবল্ এতো গাঁদি করা যে মেপে-মেপে পা ফেলতে হয়। কাগজের সোঁদা গন্ধে ঘরের বাতাস স্যাঁত্‌স্যাঁত করছে, ক্ষণকালের জন্যে জীবন যেন দুর্ব্বহ হ'য়ে ওঠে। তবু, ইন্দ্রাণীর কাছে সেই ছিলো সুদর্শনের বিস্ময়, ছাত্র হিসেবে তা'র উত্তুঙ্গ কৃতিত্ব। সুদর্শনের দুই চক্ষু যেন অতলসঞ্চারী অক্ষর-সমুদ্রের উড়ন্ত দুই পাখি। তা'র স্বাস্থ্যস্ফূর্ত্তি সমস্ত শরীরে যেন একটা বিশালতার আভাস। তা'কে এই অনুপাতে দেখে ইন্দ্রাণীর দস্তুরমতো ভয় করতে লাগলো— ভক্তিমূলক ভয়। কিন্তু সহজ হওয়ার মতো সুখ নেই, তাই সে আলাপ সুরু করলে—এবারে কল্‌কাতার হকি-লিগ্ নিয়ে, ষ্টেনোগ্রাফি শিখলে বাঙালি মেয়েরা গভর্ণমেণ্টের আপিসে চাকরি পেতে পারে কি না, ক্রস্-শুদ্ধু St. Paul's Cathedralটা ক'শো ফিট্ উঁচু। কিন্তু বিদ্যায় অতো অভ্রভেদী হ'য়েও সুশান্ত তা'র গলায় পেলো না সহজ স্বর, ব্যবহারে পেলো না সহজ পরিমিতি। রয়ে'-সয়ে' সব কথারই সে উত্তর দিলে, অথচ পরীক্ষার খাতায় যেমন সে দীপ্তি দিতে পারতো, কথায় আন্‌তে পারলো না তা'র এতোটুকু ছটা। নিতান্ত ভালোমানুষের মতো অনবরত সে ঘেমে উঠতে লাগলো। সঙ্গে জয়ন্তী ছিলো বলে'ই যা রক্ষে।

আলাপের সেই ক্ষীণ সূত্রপাত থেকে দিনে দিনে তা'দের মধ্যে রচিত হ'য়ে উঠলো স্বপ্নের কুজ্ঝটিকা, কল্পনার যতো সব সূক্ষ্ম কারুকাজ। কাউকে কারুর কিছু বলে' দিতে হ'লো না, দু'জনের মাঝেকার অপরিচয়ের ব্যবধানটা দেবতাদেরো অজান্তে হ'য়ে এলো ঘনতরো। ইন্দ্রাণীর বি-এর দুই বৎসর, পুরো। ভিজিটার্স-লিস্‌ট্‌ নাম ঠিক খাতায়-কলমে না উঠলেও ইন্দ্রাণীর জীবনে সুদর্শনই হচ্ছে প্রথম ও পরম অতিথি। দেখতে-দেখতে দু'য়ের মাঝেকার টেবলটাও উঠে গেল ও তা'রা লোহার চেয়ার দু'টো এতো ঘেঁসাঘেঁসি করে' বসতে লাগলো যে সামনের পর্দ্দাটা আর পুরোপুরি টেনে না দিলে চলে না।

কিন্তু, দু'জনে হাওয়াই কেবল খাচ্ছে, স্বাস্থ্যবৃদ্ধির কিছু সূচনা দেখা যাচ্ছে না। ভয়েল্‌ বা দিশি পপ্‌লিন কেনা বলো, চশমার নাকী বদ্‌লানো বলো, এখানে-ওখানে নিয়ে যাওয়া বলো, —দর্শনই ইন্দ্রাণীর বাহন। ও-সব তুচ্ছ মেয়ে-হস্‌টেলিপনা ছেড়ে দিই, দর্শন তাকে হোয়াইটওয়েতে নিয়ে গিয়ে চা খাইয়ে আনে, লেস্‌লির থেকে মোটর ভাড়া করে' ডায়মণ্ড হারবার ঘুরে আসে, ইট্‌লির পাঁচমাইল পূবে তপ্‌সিয়ার ঝিলে গিয়ে টিল্‌ আর স্নাইপ্‌ শিকার করে। কখনো-কখনো ছুটি বুঝে, চালাকি করে' জয়ন্তী-শুদ্ধ তাকে বাড়িতে নেমন্তন্ন করে' আনে, জয়ন্তীকে রান্নার তত্ত্বাবধানে পাঠিয়ে ইন্দ্রাণীর সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা চালায় সে য্যাকাডেমিকেল তর্ক। তবু এতো করে'ও মুখ দিয়ে তা'র আসল কথা বেরোয় না। শরীর যখনই উচ্চারিত হ'তে চায়, তা'র উপর তক্ষুনি আনে সে মনের শাসন: স্পর্শের উত্তরে মাত্র একটি

ই ন্দ্রা ণী

নিরুত্তাপ সহানুভূতি, সান্নিধ্যের উত্তরে একটি নিঃশব্দ নিষ্ক্রিয়তা। এই বেশ, এই অপরূপ।

দর্শনের কাছে ইন্দ্রাণী ছিলো কাব্যের নায়িকা, শেলির অশরীরী কল্পনা। সেও যে একটা বাস্তবতার রূঢ় দাবি করতে পারে তা'র কোথাও যেন সেই সঙ্কেত উহ্য নেই। তা'কে তা'র ভালো লাগে বটে, তা'র ক্ষিপ্র আঙুলের অগ্রভাগ থেকে বিনম্র চক্ষুর দীঘল পালকগুলি পর্য্যন্ত—কিন্তু সেই ভালো-লাগাকে ভোগে আবিল করতে তা'র ভীষণ মায়া করে, বাধে যেন তা'র কাব্যের সৌন্দর্য্যবোধে। তাই প্রচ্ছন্ন ও প্রগাঢ় হওয়া ছাড়া হ'তে পারে না সে প্রচুর, হ'তে পারে না সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

দেহের বাতায়নে বসে' ইন্দ্রাণী তা'র অনেক—অনেক প্রতীক্ষা করেছে। তা'র ভালো-লাগাকে সে উপন্যাসের বর্ণচ্ছটাময় বর্ণনার মাঝে পর্য্যবসিত করে নি, সেই অবস্থা অতিক্রম করে' সে চলে' এসেছে এখন ভালোবাসার জীবনে, জীবনের ভালোবাসায়। মহম্মদ যদি পর্ব্বতের কাছে না আসেন, পর্ব্বতকেই পথ করে' এগিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। এমন একটা বিশাল অনুভূতি নিষ্প্রাণ কাব্যের জন্যে নয়, জীবনের মুহূর্ত্তপ্রবাহের মাঝে তা'কে সঞ্চারিত করে' দিতে হ'বে। এতে নেই আর কোনো কুণ্ঠা। একেবারে উলঙ্গ, খরতরো মুক্তি। জীবন দিয়ে যা অনুভব করলাম, জীবন দিয়েই তা ভোগ করতে হ'বে।

দর্শন যে তাকে ভালোবাসে তা'তে তা'র নিজের সন্দেহ থাকলেও ইন্দ্রাণীর নেই। তা'র মুখের গাঢ়তায়, চোখের নির্নিমেষ স্নেহে, স্খলিত স্পর্শের উত্তাপে পেয়েছে সে তা'র অগাধ পরিচয়।

তা'র মনের দর্পণে পড়েছে তা'র মনের প্রতিবিম্ব। অনেক সে পড়েছে বলে' কেমন যেন সে দ্বিধাগ্রস্ত, নির্জ্জীব হ'য়ে পড়েছে। কেমন যেন সে হ্যামলেটিশ্। চেহারায় এত বড়ো একটা জোয়ান হ'য়েও মনে-মনে যে এতো ছোট, কাপুরুষ হ'তে পারে তা'র উপর সত্যিই ইন্দ্রাণীর করুণা হয়। নাগালের মাঝে যে জল, তা'র জন্যে ট্যান্ট্যালাস্এর মতো পিপাসার্ত্ত হ'য়ে শুকিয়ে মরতে দেখাও দুর্ব্বিষহ। একটু মাত্র অধ্যবসায়, আর এক ধাপ মাত্র বাকি। মাত্র মুখের একটা ডাক। পড়ে'-পড়ে' স্নায়ুমণ্ডলী তা'র শিথিল, দৃষ্টি অপরিচ্ছন্ন, বুদ্ধি একটু ভোঁতা হ'য়ে গেছে বোধ হয়। নিজে থেকে কিছু করবার যেন তা'র প্রেরণা নেই, সময়ের হাতে নিজেকে সে আলগোছে যেন তুলে দিয়েছে। ছি, ছি, মাত্র আলস্য করে' যা সে হারাবে, সমস্ত স্বর্গ-মর্ত্ত মন্থন করে'ও তা'র সে পুনরাবিষ্কার করতে পারবে না। সে কি পাগল না আর কিছু!

ইন্দ্রাণী যখন কায়মনোবাক্যে তা'র ভালো চায়, তবে কক্খনো তা'কে সে এই ভুল করতে দেবে না। ইন্দ্রাণীর ছাড়া সমস্ত সংসারে সসম্মানে আর কা'র সে মুখাপেক্ষী হ'তে পারবে? থাক্, আর দূর আকাশের তারার আলো হ'য়ে দরকার নেই, ইন্দ্রাণী হ'বে তা'র শিয়রের কাছে স্নিগ্ধ মোমের আলো। কবির কল্পনার জন্যে ভাড়া না খাটিয়ে নিয়ে আসুক তা'কে সে তা'র পাড়ার ঘরে, লাইব্রেরিতে। পেটে খিদে, মুখে লাজ—এমন দুর্ব্বল গোবেচারা পুরুষের জন্যেই কিনা তা'র স্নেহের আর অন্ত নেই! ইন্দ্রাণীর ভারি হাসি পেলো, কিন্তু ব্যাপারটা হাসির তো অতো হাল্কা নয়।

পাঁচ

পাশ্-ফিলজফির শেষ পেপারটা সাব্‌মিট করে' ইন্দ্রাণী কম্পাউণ্ড পেরিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এলো। গেটের বাইরে দর্শন দাঁড়িয়ে আছে। পরীক্ষার এ ক'দিন সেই ইন্দ্রাণীর খবরদারি করছিলো।

ইন্দ্রাণীর বাঁ হাতের মুঠো থেকে নীল্‌চে কোশ্চেন-পেপারটা টেনে নিয়ে দর্শন কৌতূহলী হ'য়ে জিগ্‌গেস করলে: কেমন হ'লো?

—ও আবার হ'বে কী? তেত্রিশ তো নম্বর! ইন্দ্রাণী দর্শনের হাতে একটা ঠেলা দিলো: তুমি মেটাফিজিক্সের বোঝ কী ছাই! চলো, আমার ভারি খিদে পেয়েছে।

কোশ্চেন-পেপারটা চার ভাঁজ করে' মুড়তে-মুড়তে দর্শন বল্‌লে,—কোথায় এখন যাবে? হস্‌টেলে?

—হস্‌টেলে না জাহান্নমে। আমার আজ এক্‌জামিন শেষ হ'লো, আর এখুনি কিনা আমি ফের খোঁয়াড়ে গিয়ে ঢুকি। বুদ্ধিকে তোমার বলিহারি। ইন্দ্রাণী ফুটপাতের উপর ডান পায়ে ছোট-ছোট দুটো লাথি মারলো: যা করবার হয় করো, আমার খিদে পেয়েছে নিদারুণ।

দর্শন বললে,—কী খাবে? কোথায়?

—বা, আমি কী জানি, তুমি আছ কী করতে?

—চলো বিড্‌ন্ ষ্ট্রিটের দিকে এগোই, ট্যাক্সি একটা পেয়ে যাবো আশা করি।

—**Let's hope.** নইলে সটান বাস্‌এ। এখনও চিপ্‌ মিড-ডে আছে। ইন্দ্রাণী হেসে ফেললো: পয়সা পকেটে যা আছে, বাঁচাও—আমার আজ একেবারে ভীমের মতো খিদে পেয়েছে। কোথায় নিয়ে যাবে বলো তো? বলতে-বলতে বাঁ হাত তুলে এস্‌প্লেনেডগামী দোতলা একটা বাস্‌কে সে দাঁড় করালো।

—না, না, বাস্‌এ কেন?

রাস্তাটা পেরোতে-পেরোতে ইন্দ্রাণী বল্‌লে,—চলে' এসো, ট্যাক্সির জন্যে অতোক্ষণ ওয়েইট্ করার আমার সময় নেই।

এস্‌প্ল্যানেডে নেমে ছু'জনে উঠলো এসে চাঙউয়া রেষ্টোর‍্যান্টে, ওটুকু রাস্তা পায়ে হেঁটেই। রোদকে সামান্য আড়াল করবার জন্যে ইন্দ্রাণী আঁচলের প্রান্তটা মাথায় তুলে দিয়েছে ঘোমটার মতো করে'; কপালে, নাকের ডগায়, ঠোঁটের উপরে, বুকের উপর ব্লাউজের ধার ঘেঁসে চিক্‌চিক্ করছে রূপোলি ঘাম। রোদে শুক্‌নো মুখখানিতে একটি কমনীয় ক্লান্তি, পরীক্ষা দেয়ার শ্রান্তিতে সমস্ত শাড়িতে-শরীরে মধুর একটি অগোছালো ভাব।

ছু'জনে একটা ক্যাবিন নিয়ে বসলো। বয় দর্শনের চোখের সামনে মেনু-কার্ডটা ধরলো মেলে, সেটা তা'র হাত থেকে ইন্দ্রাণী প্রায় কেড়ে নিলো। যতো জাঁকালো নাম, তা'র ওপরেই তা'র ততো ঝোঁক। অর্ডার দিয়ে বেশিক্ষণ বসে' থাকতেও সে রাজি

নয়। প্রতীক্ষার বোঝা আর সে টান্‌তে পারবে না। তা'র শরীরের সমস্ত রেখায় উছ্‌লে পড়ছে প্রখর অসহিষ্ণুতা : চাঞ্চল্যে সে থেকে-থেকে ঝিলিক দিয়ে উঠ্‌ছে।

প্রথম কোর্স এসে গেলো—ড্রাই। কাঁটা-চামচ সরিয়ে রেখে লতানো আঙুল দিয়ে ধরে'-ধরে' সে প্রন্‌-কাট্‌লেটগুলোতে রাই মেখে-মেখে সাবাড় করতে লাগলো। লোভীর মতো ইন্দ্রাণীর এই রসালো খাওয়া দর্শনের কাছে বিহ্বল একটা ভাবাবেশের মতো চমৎকার লাগছে : কেমন ফুলে'-ফুলে' উঠছে তা'র গাল, জিভে-দাঁতে লেগে কেমন পিছ্‌লে পড়ছে শব্দ। তারপর থেকে-থেকে চল্‌কে পড়ছে হাসি। তা'র এই খাওয়ার মধ্যে এমন একটি আদিম, বর্ব্বর নির্লজ্জতা আছে যে চোখ দিয়ে তারি স্বাদ নিতে-নিতে দর্শনের আসল খাওয়ার কথা আর ততো মনেই রইলো না।

চলেছে তো, ইন্দ্রাণী একমনে খেয়েই চলেছে। অথচ আসল যে কথা, তাই এখনো সে উচ্চারণ করতে পারছে না। আবহাওয়া তৈরি হ'বার জন্যে আর সময় দেয়া চলে না, বুলেটের মতো কথাটা এবার সে দর্শনের মুখের উপর ছুঁড়ে মারবে, দেবে তা'কে চম্‌কে ছত্রখান করে'। হ্যাঁ, যার জন্যে হঠাৎ তা'র নিদারুণ খিদে পেয়ে গেলো : না, দেরি করা চলে না আর, এই কামড়টা চিবিয়ে গলা দিয়ে গলিয়ে ফেলেই—যা থাকে কপালে আর যা করেন কালী।

দর্শনই হঠাৎ প্রশ্ন করে' বস্‌লো : বি-এ পাশ করে' এবার কী করবে ?

ইন্দ্রাণী

তাড়াতাড়ি ঢোঁকটা গিলে ফেলে কৌতুকোজ্জ্বল চক্ষু তুলে ইন্দ্রাণী বল্‌লে,—বলো তো কী করবো ?

—এম-এ পড়বে আশা করি।

মাথা ঝাঁকিয়ে ইন্দ্রাণী বল্‌লে,—ককৃখনো না।

—তবে ?

অনেকক্ষণ দর্শনের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে ইন্দ্রাণী বল্‌লে,—বিয়ে করবো।

ইন্দ্রাণীর সেই প্রশান্ত, পরিব্যাপ্ত দৃষ্টির সামনেই দর্শনের মুখ ধীরে-ধীরে নিষ্প্রভ হ'য়ে এলো। ধরা গলায় বল্‌লে,—কা'কে ?

তেমনি শাণিত ভ্রূভঙ্গি করে', কোলের থেকে ন্যাপকিন্ তুলে' নাকের তলা থেকে মুখের আধখানা ঢেকে ইন্দ্রাণী বল্‌লে,—বলো তো কা'কে ?

যেন কবরের তলা থেকে দর্শনের গলা এলো : কী জানি !

—বিশ্বের এতো বড়ো একটা মানোয়ারি জাহাজ হ'য়েও বুদ্ধিতে তুমি যে দেখছি আস্ত একটি গাধাবোট। ইন্দ্রাণী খিল্-খিল্ করে' হেসে উঠলো : আমি না বলে' দিলে কী করে' তুমি বুঝবে বলো ? তবু কিনা জাঁক করে' তোমরা বলো বুদ্ধিতে মেয়েরা তোমাদের ইন্‌ফিরিয়ার্।

দর্শন তা'র দিকে ফ্যাল্‌ফ্যাল করে' চেয়ে রইলো।

—হাঁদার মতো অমন হাঁ করে' চেয়ে আছো কী ! ইন্দ্রাণী ডান হাতে ছুরিটা তুলে দর্শনের প্লেটে টুং-টাং শব্দ করতে লাগ্‌লো, তা'র সঙ্গে তাল রেখে-রেখে বল্‌লে,—তোমাকে, তোমাকে, তোমাকে।

চেয়ারশুদ্ধ দর্শন তখুনি লাফিয়ে উঠতো হয়তো, কিন্তু বয় এসে ঢুকলো নিঃশেষিত প্লেটগুলি তুলে নিয়ে যেতে।

সে চলে' গেলে দর্শন মুখখানি তৃপ্তিতে নিটোল করে' বল্‌লে,—আমাকে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। ইস্ক্রুপ মেরে মাথার মধ্যে ছেঁদা না করে' দিলে তো মশায়ের মাথায় বুদ্ধি ঢোকে না। ইন্দ্রাণী নয়নহরণ হাসি হাস্‌লো।

দর্শন বল্‌লে,—আমাকে বিয়ে করবে কী? তুমি পাগল হ'লে নাকি, ইন্দ্রাণী?

—না, বিয়ে করবে না! কষ্ট করে' তোমার সঙ্গে এই রোদ্দুরে কতোগুলি অখাদ্য খেতে বাস্‌এ চড়ে' এইখেনে ছুটে আসবে! মামাবাড়ির কী আব্‌দার!

বয় নতুন করে' আরেক ঝাঁক ছুরি-কাঁটা রেখে গেলো।

দর্শন ছুরি দিয়ে টেব্‌ল্‌ ঠুক্‌তে-ঠুক্‌তে বল্‌লে,—আমার মাঝে তুমি কী এমন দেখলে, ইন্দ্রা—

মুচ্‌কে হেসে ইন্দ্রাণী বল্‌লে,—দেখলাম তোমার এই পাহাড়-প্রমাণ বুদ্ধি।

—তুমি নিশ্চয়ই ঠাট্টা করছ, ইন্দ্রাণী।

মুখের তরলিমা একমুহূর্ত্তে সরে' গিয়ে ফুটে উঠলো গভীর গাম্ভীর্য্য। ইন্দ্রাণী বল্‌লে,—এমন একটা ব্যাপার নিয়ে তোমরা ঠাট্টা করতে পারো, আমরা পারি না। এ-জিনিসটার গুরুত্ব আমরা যতোটা বুঝি তোমরা তা'র একবিন্দুও বোঝ না বলে' এমন একটা ঠাট্টার কথা বলতে পারলে।

—ব্যাপারটার গুরুত্বই যদি বুঝে থাকো, দর্শন বল্‌লে,— তবে আমাকে তোমার নির্ব্বাচন করার কী হ'লো? আমি একটা কী!

—উঃ, একেই বলে ইন্‌ফিরিয়রিটি কম্‌প্লেক্স্‌। ইন্দ্রাণী হেসে বল্‌লে,—তুমি আবার কী, তুমি একটি গণ্ডার।

বয় পরের কোর্স'টা নিয়ে এলো—এবার গ্রেভি।

এতো বড়ো একটা গাল খেয়েও দর্শন ঘাব্‌ড়ালো না একটুও। বল্‌লে,—খাও।

ইন্দ্রাণী বল্‌লে,—বিশেষ খিদে নেই।

—বা, এই যে তখন বলছিলে নিদারুণ খিদে পেয়েছে তোমার।

—সে মোটেই ঔদরিক খিদে নয়, স্পিরিচুয়্যাল খিদে। আঙুল দিয়ে মাংস ছিঁড়তে-ছিঁড়তে ইন্দ্রাণী বল্‌লে,—কিন্তু কথাটা অমন চাপা দিলে কেন?

দর্শন মুগ্ধ হ'য়ে তা'র মুখের দিকে চেয়ে-চেয়ে বল্‌লে,— আবার কী করে' তুমি সেই কথায় ফিরে আস তারি আশায় বসে' ছিলাম।

—তুমি তো চিরকাল বসে'ই রইলে। ইন্দ্রাণী গলায় একটু ঝাজ এনে বল্‌লে,—আর সমস্ত—এমন-কি নিজের বিয়ের বন্দোবস্তটাও কিনা আমাকে একা করতে হ'লো।

দর্শন বল্‌লে,—শেষ পর্য্যন্ত আমাকেই তুমি ঠিক করলে কেন? বারে-বারে এই কথাই শুধু আমার জিগ্‌গেস করতে ইচ্ছে হচ্ছে।

—শেষ পর্য্যন্ত নয়, গোড়া থেকেই ঠিক করে' আছি।

—আমি তো তা'র কিছুই জানি না, সত্যি নাকি ?

—বইয়ে না যতোক্ষণ লেখা থাকে ততোক্ষণ তো তুমি কিছুই জানো না। হাসিতে ইন্দ্রাণী ঝল্‌মল্‌ করে' উঠলো : তুমিই যে আমাকে ভালোবাসো, সে-কথা তুমি জানতে ?

—আমার চেয়ে তুমিই তা বেশি জানো দেখছি। কিন্তু, দর্শন আস্ত একটা আলু মুখে পুরে দিয়ে প্রায় গদ্গদ হ'য়ে বল্‌লে, —তবু, আমাকে তুমি এখনো ভালো করে' জানো না, ইন্দ্রা। আমার অক্ষমতা যে কতো—

—অক্ষমতা মানে ? শিরদাঁড়া খাড়া করে' ইন্দ্রাণী টান হ'য়ে বস্‌লো।

—না, না, ভয় নেই, হাতের ছুরিটা অমনি উঁচিয়ে ধোরো না। একমুখ খাবার নিয়ে দর্শন উঠলো হেসে : ভাষার একটা অলঙ্কার করছিলাম মাত্র। অর্থাৎ, সামান্য একটা এম-এ পাশ করে' দু'টি বচ্ছর আজ সমানে আমি ভেরেণ্ডা ভাজছি। আমার মাঝে বিয়ে করার তুমি কী পেলে ? তা'র চেয়ে—

—তা'র চেয়ে টাকার আণ্ডিল একটা মাড়োয়ারিকে বিয়ে করা আমার উচিত ছিলো।

—না, ইন্দ্রাণী, লাইট্ হয়ো না। মুখে কৃত্রিম গাম্ভীর্য্য এনে দর্শন বল্‌লে,—বিয়েটা তোমাদের কাছে তো ভীষণ গুরুতর ব্যাপার। Don't be cheap. ভেবে দেখ, পাত্র হিসেবে আমি একটা কী !

—পাত্র হিসেবে তুমি একটা পুরুষ। ইন্দ্রাণী চোখ পাকিয়ে বল্‌লে,—দেখ, আমি ছোট একরতি খুকি নই যে মুখে-মুখে এমন পরীক্ষা নেবে।

—বা, আমার কনে-দেখাটা তো সেরে নিতে হ'বে। দর্শন হেসে উঠলো : অমন ঢের পরীক্ষা তো তুমি দিয়েছ। পরে আঙুল দিয়ে খাবারগুলো আস্তে-আস্তে নাড়াচাড়া করতে-করতে বল্‌লে,—Don't be rash, ইন্দ্রাণী, তোমাকে আমি খাওয়াবো কী! একটা চাকৃরি-বাকৃরি কোথাও খুঁজে পাচ্ছি না।

ইন্দ্রাণী হেসে বল্‌লে,—তা নিয়ে তোমার মাথা ঘামাতে হ'বে না। তুমি না পারো, আমি তোমাকে খাওয়াবো। চাকরি চাও, আমার আণ্ডারে কোনো একটা ইস্কুল-টিস্কুলে একটা দপ্তরি বা দরোয়ানির কাজে ঢুকিয়ে দিতে পারবো অনায়াসে।

—আঃ, চেয়ারে পিঠ ছেড়ে দিয়ে দর্শন স্বস্তির নিশ্বাস ফেল্‌লে : তা হ'লে আর ভাবনা নেই। বিয়ে আমরা তবে কবে করছি?

এবার দর্শন এগিয়েছে দেখে ইন্দ্রাণী মিইয়ে গেলো। বল্‌লে, —না, তুমি আগাগোড়া সব ভেবে দেখ, আমি বল্‌লাম বলে'ই তো আর তুমি বিয়ে করতে পারো না।

—বা, তুমি এই মাত্র বল্‌লে যে বিয়ে করলে আমাকে চাকরি জোগাড় করে' দেবে। এখন কথা ফিরিয়ে নিলে চলবে কেন? এমন পাত্রী আমি বাঙলা দেশে কোথায় পাবো বলো?

মুখ গম্ভীর করে' ইন্দ্রাণী বল্‌লে—না, আমার মুখের কথায় কী এসে যায়? তুমি যা করবে, নিজে ভেবে দেখ।

ইন্দ্রাণী

হাতের ছুরি ফেলে দিয়ে ইন্দ্রাণীর একখানি হাত মুঠোর মধ্যে টেনে নিয়ে দর্শন বল্‌লে,—ভাববার সময় অনেক পাবো পরে, কিন্তু এমন মুখের কথা সমস্ত পৃথিবী ঘুরলেও আমি শুনতে পাবো না। মুখের এমন কথা ক'জন বলতে পারে ?

হাতখানা সরিয়ে আনতে-আনতে ইন্দ্রাণী বল্‌লে—**Don't be light.** আমাকে বিয়ে করলে তোমাদের বাড়িতে নিশ্চয়ই একটা গোলমাল উঠবে।

—বা, দর্শন বিস্মিত হ'য়ে বল্‌লে,—সে কথা তো আমিই তোমাকে বল্‌তে যাচ্ছিলাম।

—আমার জন্যে ভেবো না, সে-বাড়ি আমি ছেড়ে আসছি।

—তবে আমার জন্যে ভাববো ? তুমি আমাকে কী ভাবো বলো দেখি। এই না খানিক আগে বল্‌ছিলে আমি একজন পুরুষ।

—তা তো বলছিলাম, ইন্দ্রাণী ন্যাপ্‌কিনে হাত মুছতে-মুছতে বল্‌লে,—কিন্তু, থাক, আমিই সব ম্যানেজ করতে পারবো। আমি তোমার মা'র এমন কিছু অযোগ্য পুত্রবধূ হ'বো না।

দর্শন চোখ বড়ো করে' বল্‌লে,—কথাটা তুমি অযোগ্য পুত্রবধূ বল্‌লে, না, অযোগ্যপুত্রবধূ বল্‌লে ?

—যখন হ'বো না, যাই বলি না কেন, কিছু এসে যায় না। এবার চলো।

—বা, হ'য়ে গেলো ? আর কিছু খাবে না ?

—আচ্ছা, নাও দু'টো আইস্‌ক্রিম।

—বোয় !

নীলচে বাটিতে দুই তাল আইস্‌ক্রিম এসে হাজির।

চামচেয় করে' ছোট-ছোট চুমুক নিতে-নিতে ইন্দ্রাণী বল্‌লে,—বিয়েটা কোথায় হ'বে?

—তাই ভাবছি।

—At all হ'বে তো?

—Lord! দর্শন চেয়ারের পিঠে ঢলে' পড়লো : যদি বলো তো, কালকেই।

—কোথায়?

তা'র দিকে চেয়ে মুচ্‌কে-মুচ্‌কে হেসে দর্শন বল্‌লে,—তাই ভাবছি।

ইন্দ্রাণী ঝরঝর করে' হেসে ফেল্‌লে।

হাত তুলে দর্শন বল্‌লে,—আমার মাথায় একটা ব্রিলিয়্যাণ্ট আইডিয়া এসেছে। জয়ন্তীদের ওখানে চলো, ওর স্বামী আমাদের সাহায্য করতে পারবে।

—সে তো রাঁচি।

—মন্দ কী! বিয়ে আর হনিমুন একজায়গাতেই সেরে নেয়া যাবে। শরৎকে আমি চিঠি লিখে দিচ্ছি। কালকেই তবে হয় না অবিশ্যি।

—না হোক্‌। বয়কে বিল আনতে বলো। ইন্দ্রাণী ব্লাউজের ভেতর থেকে তা'র ছোট্ট মনি-ব্যাগটি বা'র করলে : এদিকে আমার পরীক্ষার রেজাল্টটা বেরোক্‌। তুমি ততোদিন তোমার মা-দাদাদের মত পেতে চেষ্টা করো।

—সে হচ্ছে, কিন্তু বিল্‌টা তুমিই দেবে নাকি ভেবেছ?

—রীতিমতো। তুমি আমাকে কষ্ট করে' বিয়ে করে' খাওয়াবে বলে'ই তো তোমাকে একটু খাওয়ালাম।

—বা, তখন যে বললে আমাকে পয়সা বাঁচাতে। আমাকে ট্যাক্সি নিতে দিলে না।

—নিশ্চয়, পরে তোমার পয়সার কতো দরকার হ'বে খেয়াল আছে? এখন থেকে জমাতে না শিখলে চলবে কেন? ইন্দ্রাণী দশ টাকার একটা নোট বা'র করলো : আমারই বরং পরে আর চাকরি থাকবে না, হাতে যা দু'চার পয়সা আছে তোমার সঙ্গে উড়িয়ে দিয়ে যাই। ডাকো না তোমার বোয়কে।

দর্শন বল্‌লে,—চাকরি থাকবে না কী বলছ? বা, এই যে বল্‌লে বিয়ে করে' আমাকে খাওয়াবে।

—আহ্লাদ! ইন্দ্রাণী হেসে বল্‌লে,—চাকরি করবার জন্যে ওঁকে বিয়ে করতে যা'বে। তুমি আছো কী করতে? আমি ও-সব জানি না, আমার তখন অনেক কাজ। ডাকো।

বিল্ চুকিয়ে, খুসিতে ঝলমল করতে-করতে দু'জনে বেরিয়ে এলো। দরজার সামনেই ট্যাক্সি, হেঁটে বাস্ ধরবার কোনো মানে হয় না এখন। এখন নির্ব্যবধান নিবিড়তা, এখন উদ্দাম উন্মুক্ত গতি।

দর্শন বল্‌লে,—তুমি বিয়ে করছ শুনে হস্‌টেলের তোমার যুগনারীর মেয়েরা তোমাকে ফাঁসি দেবে। বিয়ে করাটা তো তা'দের মতে একটা লজ্জার ব্যাপার।

—কোনো সুস্থ মেয়ের মতেই নয়। বিয়ে না-হওয়াটাকেই যারা বিয়ে না-করা মনে করে আমি তা'দের দলে নই। আমি

জীবনকে ভীষণ ভালোবাসি, কথাটা **cheap claptrap**এর মতো শোনাচ্ছে নাকি? কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, ইন্দ্রাণীর মাথাটা দর্শনের কাঁধের উপর প্রায় নেমে এলো: **There could be nothing higher than the purpose of human life.**

ত'ার কপালের কাছেকার চুলগুলিতে হাত বুলুতে-বুলুতে দর্শন বল্‌লে,—গাড়িটাকে কোথায় যেতে বলবো?

—আইনের টেক্‌নিক্যালিটি না থাকলে এখুনিই আমাকে তোমাদের বাড়ি নিয়ে যেতে বলতাম। তা'র যখন দেরি আছে এখনো, আপাততো হস্‌টেলেই ফিরে যাই।

ছয়

মা:ঝের মাস তিনেক, মানে, ইন্দ্রাণীর রেজাল্ট না বেরুনো পর্য্যন্ত, কোনো রকমে তা'রা সাঁৎরে পার হ'লো। পার হ'লো বটে, কিন্তু দর্শন তা'র এরকম বিয়েতে কিছুতেই বাড়ির মত করাতে পারলো না।

মত করাবার খানিকটা দরকার ছিলো বৈ কি। ভালোবাসার অভিনয়টা গুরুস্থানীয়দের চোখের আড়ালে ঘটতে পারে, কিন্তু বিয়ে-নামক বিজাতীয় ব্যাপারটার উদ্দেশ্যই হচ্ছে সেটাকে প্রকাণ্ড একটা বিজ্ঞাপন দেয়া। আগুন চেপে রাখা যায়, কিন্তু বিয়ে কখনো গোপন করা যায় না। এ-হেন একটা রাজকীয় ব্যাপারে তাঁদের নিশ্চয়ই একটা সম্মতি চাই যাঁরা প্রতি মাসে তা'কে হাতখরচের টাকা দিয়ে যাচ্ছেন। আর সে-টাকার সংখ্যাটা তা'র পক্ষে নিতান্ত সূক্ষ্মদেহী নয়। সিজ্‌ন্‌ চলে' গিয়েছে বলে' টিউসানির বাজার এখন মন্দা—জুলাই পর্য্যন্ত চল্‌বে এ ডিপ্রেশান্‌। ততোদিন ফুটবল চলবে পুরোদমে, রোদে তেতে বৃষ্টিতে ভিজে তারপর আছে চায়ের দোকান। বাস্‌, দু' মিনিট দেরি হ'য়ে গেলেই ট্যাক্সি। ততোদিন বায়স্কোপগুলোও বন্ধ থাকবে না।

খাই না-খাই—খরচের তো আভিজাত্য আছে। চারটে মাস তো সমানে—বড়-দা না হ'লে মেজ-দা, মেজ-দা না হ'লে মা, এমনি দোরে-দোরে ফিরতে হ'বে! তারপর দাদার মেস্‌এ আছে—খাওয়ার খরচ, সিট-রেণ্ট লাগে না, দিব্যি আরামে আছে গা ঢেলে। অন্তত মুখের একটা মত চাই বই কি। সব চেয়ে বড়ো বিপদ হচ্ছে এই যে কয়েকমাস আগে থেকেই 'বিয়ে করবো না' 'বিয়ে করবো না' বলে' একটা সে হাইদরি হাঁক তুলেছিলো, অন্তত নিজের গোড়ালিতে ভর দিয়ে দাঁড়াবার আগে পর্য্যন্ত মাড়াবেই না সেই হাটের রাস্তা। এতো ডঙ্কা বাজিয়ে এখন সানাই ধরতে তা'র লজ্জা হচ্ছে। এতো ঝল্‌সে এখন একেবারে চুপ্‌সে যেতে নিজের কাছেই কেমন বিশ্রী লাগছিলো।

তবু কথাটা পাড়তেই হয় কোনো রকমে। ক'দিন থেকে সে একটা ধুয়ো ধরলো: কাজকর্ম্ম হচ্ছে না, চুপচাপ বসে' আছি হাত-পা ছড়িয়ে, বিয়ে এখন একটা করে' ফেল্‌লেই তো পারি।

মেজোবৌদি টিপ্পনি কাটলেন: ভাটার নৌকো আবার উজোন যেতে চায় কোন্ হিসেবে? এই না খুব হুঙ্কার দিচ্ছিলে যে লাইফে কোনোদিন বিয়ে করবে না।

দর্শন বল্‌লে,—বা, তেমন মেয়ে হ'লে ককৃখনো বিয়ে করবো না বলেছি? নেভার।

—আর তেমন মেয়ে নয়, ঠাকুরপো, এখন যেমন-তেমন একটা হ'লেই হয়।

সঙ্গে-সঙ্গে হাসলেও কথাটা উঠতে-বস্‌তে বাড়িময় এমন রাষ্ট্র হ'য়ে গেলো যে সৌদামিনী আর আড়ালে থাকতে পারলেন না। দর্শনকে নিভৃতে পেয়ে বল্‌লেন : কী, এখন মত বদলেছে নাকি? ছাখ্‌, হাতে এখনো এক গাদা সম্বন্ধ আছে, বলিস্‌ তো নাড়াচাড়া করে' দেখি, স্থরেনকে বলি।

দর্শন, যা তা'র স্বভাব, কথাটার মুখোমুখি দাঁড়াতে পারলো না সাহস করে'।

অস্পষ্ট, প্রায় অতীন্দ্রিয় একটা ইঙ্গিত করে' সে বল্‌লে,—তুমি পাগল হয়েছ মা, ও সব বাজে, রট্‌ন্‌ মেয়ে আমি বিয়ে করবো নাকি?

মা আধো-খুসি আধো-শঙ্কিত হ'য়ে বল্‌লেন,—না-দেখেই মত দিয়ে ফেলিস্‌ না—

—না মা, দেখেই বলছি। কথাটাকে আর টান্‌বার সাহস না পেয়ে দর্শন গেলো বাহাদুরি দেখাতে: বিয়ে যদি করবো তো একটা সমাজসংস্কারের দৃষ্টান্ত দেখাবো। নইলে কী ছাই বিয়ে করছি।

ছেলের অন্যান্য প্রলাপ-ঘোষণারই একটা মনে করে' সৌদামিনী সকৌতুকে জিগ্‌গেস করলেন : সেটা কী?

—একটা আন্তর্জ্জাতিক বিবাহ।

—সেটা আবার কী উৎপাত!

—অথবা বলতে পারো প্রতিলোম বিবাহ। কায়স্থের ছেলে হ'য়ে একটি ব্রাহ্মণকন্যার পাণিগ্রহণ করবো। জল বা জীবন দুই অর্থেই।

ই ন্দ্রা ণী

সৌদামিনী মুখ গম্ভীর করে' বললেন,—ফাজ্‌লামো করিস্‌ নে। এবার আর গড়িমসি নয়, বিয়ে দিয়ে দি। ঘরে লক্ষ্মী এলে যদি কিছু ছিরি ছাঁদ ফেরে। সেই এম-এ পাশ করার পরই যদি বিয়েটা করতিস্‌, পাওয়া-থোওয়া নিয়ে ভাবনা থাকতো না। এখন যতোই দিন যাচ্ছে গুণমণির ততোই শশিকলা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তখন ছিলি সোনার-মেডেল-পাওয়া ছেলে, এখন একজন ভাড়াটে বাড়ির-মাষ্টার। এ অবস্থায় কে তোকে কী দেবে ভেবেছিস্‌? এতো সাধের তুই, তোকে দিয়ে আর কী পাওয়া যাবে?

—সর্ব্বনাশ! তারপর আবার দেনাপাওনার কথা আছে যে। দর্শন চোঁচা পালিয়ে গেলো।

ইন্দ্রাণীকে গিয়ে বল্‌লে,—বাড়ির মত করতে পারবো বলে' মনে হয় না। তা, ঐ risk আমি নেবো, হাজার বার নেবো। রোজগার করতে পারলেই জানো ইন্দ্রাণী, সমাজ পর্য্যন্ত পায়ের কাছে কুকুর হ'য়ে থাকে। যতো অত্যাচার তা'দেরই ওপর, যারা গরিব, অর্থাৎ যারা দুর্ব্বল। তুমি কিছু ভেবো না, ও ঠিক হ'য়ে যাবে। কোথায় ফেলতে পারবে আমাকে? দর্শন হো-হো করে' শিশুর মতো হেসে উঠলো: মা'র কোলের ছেলে, দাদাদের **full-brother**।

ইন্দ্রাণী সামান্য গম্ভীর হ'য়ে বল্‌লে,—না, আমি কিছু ভাবছি না। তবু, বিয়ে করে' আমরা কিন্তু তোমাদের বাড়িতে গিয়েই উঠবো। তুমি টাকা রোজগারের কথা ভাবছ, আমি ভাবছি, আমি কী এতোদিন তবে লেখাপড়ার চর্চ্চা করলাম,—বাড়িশুদ্ধ

সবাইকে যদি না বশ করতে পারি তবে এতো দিন কী সাইকোলজি পড়লাম ছাই। মা-ই বা আমাকে কেমন করে' ফেলেন আমি দেখবো। ইন্দ্রাণী হাসলো: তাঁর অকর্ম্মা খোঁড়া ছেলেটিকে সেবা করতে দেখে তিনি নিশ্চয় স্বস্তিই পাবেন, কী বলো?

দর্শন বল্‌লে,—এই খোঁড়ারাই আসল যুদ্ধ করে, ইন্দ্রাণী, কেননা পালানো তা'দের পক্ষে অসম্ভব! ভয় হয় তোমার মতো এই সব পলায়নক্ষম সুস্থ ব্যক্তিদের দেখে।

ইন্দ্রাণী তা'র হাতে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বল্‌লে,—কিচ্ছু তোমার ভয় নেই। সে আমি—আমি—আমি।

সাহস পেয়ে দর্শন মাঝের ক'টা দিন একেবারে চুপ করে' গেলো। রাঁচি যাবার দিন সকালবেলা মাকে বল্‌লে, এক বিয়েতে যাচ্ছি: বিকেলে বৌদিদিদের বল্‌লে, যাচ্ছি বিয়ে করতে।

পাগলে কী না বলে!

সত্যি-সত্যি। রাঁচি থেকে দর্শনের প্রকাণ্ড দুই চিঠি এসে হাজির—একখানা শ্রীযুক্তা মাতৃদেবীর কাছে, অন্যখানা বড়-দা'র। প্রথমটা বাঙলায়, দ্বিতীয়টা ইংরিজিতে। চিঠি পড়ে' বাড়িশুদ্ধ সবাই একদিন মাথায় হাত দিয়ে বসে' পড়লো। বৌদিদিরা পর্য্যন্ত নেপথ্যে একটা ঠাট্টা করতে পারলো না।

নাম নেই, ধাম নেই, রাঁচির কোন এক ক্রিশ্চানিই বিয়ে করে' বসেছে হয়তো। আবার লিখেছে: বৌ নিয়ে বাড়ি ফিরছি শিগ্‌গির। কুলোয় করে' তাদের বরণ করবে, না, কুলোর

হাওয়ায় তাদের বিদায় করবে—সৌদামিনী হাপুস চোখে কাঁদতে বসলেন।

বড়-দা বল্‌লেন,—কী কাঁদতে লেগেছ মা, ও হচ্ছে ওর একটা রসিকতা। ভাবলে একটা ডজ্‌ দিয়ে খানিকটা সবাইর হুঁস করা যাক্। পাজিটা একবার আসুক। ঘাড় ধরে' এবার যদি না ওর বিয়ে দিয়েছি তো কী!

সেটাকে বড়ো বেশি কেউ রসিকতা বলে' ধরে' নিতে পারলো না, যখন দেখা গেলো, একদিন সকালবেলা সঙ্গে একটি মেয়ে নিয়ে দর্শন বাড়ি ঢুকছে। গাঁটছড়া অবিশ্যি বাঁধা নেই, কিন্তু সদ্যসিঁতুরমাখানো সিঁথিটা একেবারে তকৃতক্ করছে নতুন। ঐ চিঠির পর, এ-মেয়ে আর দর্শনের বৌ না হ'য়ে যায় না।

সকালবেলা—বাড়িশুদ্ধু লোক উপস্থিত। দর্শন ও তা'র সঙ্গের মেয়েটি বলা-কওয়া-নেই একে-একে সবাইকে প্রণাম করতে লাগলো। আগে দাদাদের, বৌদিদি তু'জনকে, সবশেষে দূরে-দাঁড়ানো মাকে। শুধু মা'র কাছে এসে দর্শন অস্ফুটস্বরে বল্‌লে,—আমার বৌ, মা।

নিচেটা তখন এতো স্তব্ধ যে সবাইর কানেই কথাটা প্রবেশ করলো।

সবাইর সম্মিলিত দৃষ্টি একটি তীক্ষ্ণ সরল রেখায় ইন্দ্রাণীর মুখে এসে বিদ্ধ হ'লো। সৌদামিনী প্রায় একটা আর্তনাদ করে' উঠলেন: এ কী, ইন্দ্রাণী না?

নীরদা বলে' উঠলো: আরে, সেই ইন্দ্রাণীই তো। এ কী ও!

নিভা চোখ কপালে তুলে বল্লে,—হ্যাঁ সেইদিনই তো আমার সঙ্গে বসে' একথালা লুচি খেয়ে গেলো। এ কী সব্বনেশে কথা! পেটে-পেটে এতো বুদ্ধি!

নিতান্তই যখন ভাদ্রবধূ—তখন ভাসুররা আর সেখানে কী করে' দাঁড়িয়ে থাকেন। শুধু বড়-দা গম্ভীর গলায় বলে' গেলেন : বিয়েই যখন করে' এসেছে, একবার একঝাঁক উলু দাও।

সৌদামিনী ইন্দ্রাণীর মুখের সামনে এসে ফোঁস্ করে' উঠলেন : কেমন ভালোমানুষের মেয়ে তুমি শুনি? শেষকালে আমার ছেলের মাথাটা তুমি চিবিয়ে খেলে?

ইন্দ্রাণী কোনো কথা বল্লো না, শান্ত মুখে দাঁড়িয়ে রইলো। সে এমনিতরো একটা অভিবাদনের জন্যেই প্রস্তুত হ'য়ে ছিলো, কিন্তু একেবারে এতোটা হয়তো আশা করে নি। এর আগে যতোবার সে এ-বাড়ি এসেছে, পেয়েছে অবারিত অভ্যর্থনা, প্রায় একটা অভ্রভেদী সম্মান,—দু'টি দিনেই সে-স্বর যাবে বদ্‌লে, সম্পর্ক যাবে উল্‌টে, এতোটা সে সময়ের এই চিরপরিবর্ত্তনশীলতার মধ্যেও কল্পনা করতে পারতো না। যতোবার এসেছে, সবাইর সঙ্গে মিশেছে সে মন খুলে, গেয়েছে কতো গান, তুলেছে কতো হাসির তরঙ্গ। এ-বাড়িতে এসে বরং দর্শনের সঙ্গেই তা'র দেখাশোনা হ'তো না : এদের সবাইর কাণ্ড-কারখানা দেখলে মনে হ'তো ইন্দ্রাণী যেন এদেরই কাছে বেড়াতে এসেছে, তা'দের সে কতো চেনা, কতো আপনার। এতোদিনের এতো পরিচয় আজ তা'র সত্যিকারের পরিচয় দিতে গিয়েই ভেস্তে গেলো, এতো হাসি-হুল্লোড়, এতো গান-বাজনা, কিছুতেই কিছুর সুরাহা

হ'লো না। আজ যেন এরা চিনতেই পাচ্ছে না ইন্দ্রাণীকে : আজ সে যেন তা'দের কতো পর হ'য়ে এসেছে। ছেলের বন্ধু হ'য়ে আসতে কোনো বাধা নেই, যতো অপরাধ ছেলের বধূ হ'য়ে আসতে। অথচ ইন্দ্রাণী এমন একটা সমাজান্তর্ভুক্ত কাজ করলে, বিবাহের চেয়ে বড়ো কিছুতে জোর দিলো না! কিসে মানুষের মনের আবহাওয়া বদ্‌লে যায় বোঝা মুস্কিল। অথচ ইন্দ্রাণী সেই ইন্দ্রাণী : মেয়ে-পুরুষের গুণানুসারিক তারতম্যবিচারের তর্কে দর্শনের বিরুদ্ধে বৌদিদিদের হাতে সে ছিলো একটা প্রকাণ্ড দৃষ্টান্ত। আজ বিদ্যার্জ্জনের কৃতিত্বটা পর্য্যন্ত তা'র পক্ষে একটা অনপনেয় কলঙ্ক, চরিত্রশৈথিল্যেরই ও-পিঠ। যে-গুণ আগে তা'র রূপবর্দ্ধন ছিলো, এখন তাই হয়েছে একটা শারীরিক কদর্য্যতা। পড়ে'-পড়ে' তা'র চোখ খারাপ হয়েছে, এটা আগে ছিলো একটা সকৌতুক কৌতূহলের বিষয়, এখন তা একটা জাজ্জ্বল্যমান নির্লজ্জতার। আগে তা'কে যে-ই দেখেছে সেই একবাক্যে বলেছে সুন্দর, তা'র রূপবিচারে মাত্র তখন দেহটাকেই মানদণ্ড বলে' ধরা হ'তো না, তা'র মাঝে ছিলো তা'র খ্যাতির দীপ্তি, গানের লাবণ্য, প্রতিভার আলো। আজ সে-সব প্রসাধনের অস্তিত্ব নেই : আজ নাকটা তা'র কতোখানি বেঁটে, মুখের হাঁ-টা কতো বড়ো, চোয়ালটা কতো চওড়া। মাথার চুল পাতলা, যাকে বলে খড়ম-পা। তখন খোঁপা ফুলিয়ে জুতো পরে' আসতো-যেতো—কে অতো তা লক্ষ্য করেছে? অথচ, আগে একদিন সৌদামিনীই চিবুক ধরে' সোহাগ করে' বলেছিলেন : এমন একটি লক্ষ্মীমন্ত বৌ এলে

ঘর-দোর আমার ঝল্‌মল্‌ করে' ওঠে। যতোদিন পর্য্যন্ত বৌ হ'য়ে সে আসে নি ততোদিনই তা'র প্রতিষ্ঠা ছিলো, এখন স্ত্রীত্বই যেন তা'র পক্ষে একটা ব্যভিচার। যতোক্ষণ পর্য্যন্ত দু'য়ের মাঝে প্রেম, ততোক্ষণ পর্য্যন্ত পুরুষ অপরাধী, আর, বিয়ে হ'য়ে গেলেই যতো দোষ মেয়ের।

সৌদামিনী তিরস্কারের ভঙ্গিতে বললেন,—তুমি বামুনের মেয়ে হ'য়ে এমন কেলেঙ্কারিটা কী বলে' করলে বলো দিকি? তোমার মা-বাবাই বা কী করে' মত দিতে গেলেন?

ইন্দ্রাণী হেসে বল্‌লে,—সব মা-বাবাই সমান, মা। মত দিতে যেমন তাঁরা কুণ্ঠিত, আবার তেমনি তাঁরা উদার।

তবু সৌদামিনীর মনস্তাপটা সে খানিক বোঝে: ছেলে ক্ষমতাপ্রয়োগে তাঁকে অতিক্রম করে' গেলো এটা তাঁকে স্বভাবতোই পীড়া দেবার কথা। ছেলের বিয়েতে তাঁর সাধ-আহ্লাদের কিছুই পূর্ণ হ'লো না, এটা তাঁর মাতৃত্বগর্ব্বকে ক্ষুণ্ণ করছিলো, কিন্তু সেই নীরদা আর নিভা যে আজ কী বলে' মুখ বাঁকায় ও নাক কুঁচকোয়, সেইটেতেই ইন্দ্রাণী অবাক হচ্ছে। এতোদিন ইন্দ্রাণী কৌমার্য্য ও কৃতিত্বের উত্তুঙ্গ চূড়ায় অধিষ্ঠান করছিলো, এখন নেমে এসেছে তা'দের সঙ্গে সমান সমতল জায়গায়, সংসারের আবর্জ্জনায়, একেবারে উনুনের পাশটিতে। এখন আর তবে তা'র কিসের সম্ভ্রম, কিসের বিশিষ্টতা। সেই তো বাপু পুরুষের কাঁধে এসেই ভর করতে হচ্ছে, ঠেলতে হচ্ছে হাঁড়ি, সাজতে হচ্ছে পান, দিতে হচ্ছে লক্ষ্মীর সাজ। এই যখন গতি, তখন এতো পেখম মেলবার কী হয়েছিলো!

তা'দেরই দলে এসে যখন নাম লেখাতে হ'লো তখন ও-সব পাখা-ফর্‌ফরানির আর কী দাম! তা'দের দলে মেয়েমানুষদের আর কোনো আলাদা দাম নেই, স্বামীর রোজগারের অঙ্ক অনুসারেই তা'দের মর্য্যাদার ক্রমান্বয়। বিবাহিতা মেয়েদের সেই হচ্ছে আসল কৌলীন্য-নির্ণেতা—তা'দের স্বামীর মনি-ব্যাগ। সেই দিক দিয়ে দেখতে গেলে ইন্দ্রাণী বনবাসিনী সীতার চেয়েও অকিঞ্চিৎকর—ঠাকুরপো বহু চেষ্টা-চরিত্র করে' মাত্র একটা চল্লিশ টাকার টিউসানি জোগাড় করতে পেরেছে।

এতোকাল, মানে বিয়ে হওয়ার আগে পর্য্যন্ত, ইন্দ্রাণীকে তা'রা সমিহ করতো: কি-কি তা'র কীর্ত্তি তা'র বিশাল সমুদ্রে তা'রা থৈ পেতো না। এখন, যখন সে তা'দের ভিড়ে এসে জুড়ে বস্‌লো, খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে হিসেব করে' তা'রা তা'র অকীর্ত্তি বা'র করতে লাগলো—অগণন যতো ত্রুটি। সামান্য উনুন ধরাতে জানে না, জানে না আঁচল সামলে পরিবেষণ করতে। রান্না করতে গেলেই চশমা ওঠে চোখের জলে ঝাপসা হ'য়ে, তরকারি কুটছে না আঙুল কুটছে বোঝা দায়। সেই মল-ই যখন খসালি, মিছিমিছি তখন লোক হাসাতে গেলি কেন? বিদ্যের এতো বহর দেখিয়েও তো কোনো কাজ হ'লো না—সেই তো এক গোয়ালের গরু। যখন ধানই ভান্‌তে হ'বে তখন একটু ভালো করে' ঢেঁকি হ'লেই হ'তো। নীরদা আর নিভাকে তুমি এদিক থেকে টেক্কা দিতে পারবে না। তা'দের ভাবখানা এই যে, তা'রাই পেয়েছে আসল শিক্ষা, ইন্দ্রাণীর মতো তা'রা দু' পৃষ্ঠা খবরের কাগজ পড়ে' দেশোদ্ধার করতে নামেনি।

ইন্দ্রাণী

ধীরে-ধীরে তা'দেরো মনোভাবের সে একটা হদিস্ পেলো। সম্পর্কে ছোট, সংসারচালনার বুদ্ধিতে অনভিজ্ঞ, তারপর ঠাকুরপোর যখন টাকার জোর নেই, তখন সব বিষয়েই ইন্দ্রাণী তা'দের মুখাপেক্ষী। যতোই লেখাপড়া শেখো না কেন, মেয়েমানুষের এই গিন্নিপনাই হচ্ছে আসল অহঙ্কারের জিনিস। এদিক থেকে ইন্দ্রাণী একেবারে নাবালিকা, তা'র কোনোই মূলধন নেই। সবাই স্থরু করলো তা'র দুর্ব্বলতার উপর অনবরত ঠোকর মারতে : ক্ষুদে পিঁপড়ের কামড়ের মতো কথার চিম্‌টি কাটতে তা'রা ওস্তাদ।

আত্মসম্মানের জ্ঞান তা'র তীব্রতরো হ'লেও ইন্দ্রাণী চুপ করে'ই আছে—আশ্চর্য্য রকম চুপ করে' আছে। নিজেকে এমন নিস্তেজ, নিস্প্রভ করে' এনেছে যে দেখলে আর মনেই হয় না তা'র জীবনে আছে কোনো কামনার দাহ, কোনো প্রতিভার দৈবী প্রেরণা। নিতান্তই লাজুক যেন একটি গ্রাম্য বধূ, সবার চেয়ে আজ সে নিঃশব্দ, সবার পেছনে থেকে পায়ের চিহ্ন ধরে' সে অনুগামিনী। আজ আর তা'র কোনো ব্যস্ততা নেই : প্রেম যখন সে পেয়ে গেছে, তখন জীবন নিয়ে প্রতীক্ষা করবার তা'র এখন অনেক সময়। আর আসলে সে একজন প্রকাণ্ড অপ্‌টিমিস্‌ট্‌। সবাইকে সে যে তা'র ব্যবহারে বশ করতে পারবে, তা'র সৌরভে সম্মোহিত—এতে তা'র ছিলো পরিপূর্ণ আত্মপ্রত্যয়। মননশক্তিতে তা'র ছিলো এমন প্রবল মৌলিকতা যে সমস্ত ব্যাপারটা অনুধাবন করে', বল্‌তে গেলে, মজাই পাচ্ছিলো সে বেশি। জীবনে নতুন একটা অভিনয় করতে তা'র তো বেশ ভালোই লাগছে।

সাত

বিয়ে করার পর থেকে ইন্দ্রাণীর কাছে দর্শন কেমন লজ্জিত, কেমন অপরাধী। এ তা'কে সে কোথায় নিয়ে এলো? দু' মাসেই তা'র চেহারা এসেছে চুপ্‌সে, সেই উৎসাহ-উদ্ভাসিত শরীরে এসেছে অবসাদ। তা'র তপ্ত, নিবিড়াভ, গভীর ভালোবাসা ছাড়া কিছুই দর্শনের বিত্ত-বেসাতি নেই, কিন্তু ইন্দ্রাণী ঘরের কোণে বসে' স্বামীর সঙ্গে বিশ্রম্ভালাপ করে' জীবন অতিবাহিত করবার মেয়ে নয়। এ তা'কে সে কোথায় নিয়ে এলো, কোথাকার চারাগাছ উপ্‌ড়ে এনে পুঁতলে সে এ কোন গেরু-মাটিতে? কোথায় পাবে এ রস, কোথায় মেলবে এ শেকড়, কোথায় তুলবে এ মাথা। ইন্দ্রাণীর মুখের দিকে চাইতে পর্য্যন্ত তা'র লজ্জা করে।

ইদানি পড়েছে ইন্দ্রাণীর নিদারুণ খাট্‌নি; মনে করতে হ'বে, তা'র পক্ষে নিদারুণ। বেড়াবার ছড়ি দিয়ে গল্‌ফ্ খেলা যায় না। নিতান্তই যখন সে বাড়ির বৌ হ'য়ে এলো, তখন কিছু ভার তা'র নিতে হ'বে বৈ কি। ঝি-টাকে রাখার আর দরকার নেই, একটা চাকরই যথেষ্ট। চাকর যদি অসুস্থ হ'য়ে পড়ে, তিন জায়ে ভাগাভাগি করে' বাসন-কোসনগুলি মেজে ফেলতে হ'বে। ধরা

যাক্, বিনি-মাইনেয় একটা বাম্‌নিই না-হয় রাখা গেছে—ঘুরে-ফিরে একবেলা ইন্দ্রাণীকে রাঁধ্‌তেই হয়। বিকেল বেলা বেরুবার সে ফাঁকই খুঁজে পায় না, আর পেলেই বা কী। দু'জা বাড়িতে বসে' খেটে মরবে, আর সে যাবে সোয়ামির সঙ্গে হাওয়া খেতে—এমন ঢঙের কথা মুখ ফুটে সে বলুক না একবার। বৌ নিয়ে হাওয়া খেয়ে বেড়ানোর টাকাটা না-উড়িয়ে সংসারে দিলে বরং কাজ হয়। একটা গান পর্য্যন্ত সে আর এখন গায় না। সংসারের কাছে তা'র এই নীরবতাই এখন শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত।

ইলেক্‌ট্রিক-বিল্‌টা এ-মাসে একটু ভারি হয়েছে। বড়-দা মুখ হাঁড়ি করে' গজরাতে স্থরু করেছেন: দিন-দিন খরচ কেবল বেড়েই চলেছে। কোথা থেকে এক পয়সা আয়ের সংস্থান নেই, কেবল খরচ আর খরচ।

নীরদার গা-টা চড়্‌চড়্ করে' উঠলো; কথায় ঠেস্ দিয়ে বল্‌লে,—রাত দু'টো-আড়াইটে অবধি আলো জ্বালিয়ে বসে' প্রেমালাপ করলে মিটারটা শুনবে কেন?

প্রেমালাপ করতে, অন্তত স্ত্রীর সঙ্গে প্রেমালাপ করতে যে আলোর দরকার হয় না, এটা বড়োবৌদির জানা উচিত ছিলো। প্রাইভেটে এম-এ দেবার জন্যে ইন্দ্রাণী এখন থেকেই অল্প-বিস্তর তৈরি হচ্ছে বলে' এগারোটা বাজতে-না-বাজতেই সে ঘুমুতে যেতে পারে না: সমস্ত দিনের গ্লানির পর এই বইগুলিতেই যা একটু সে পরিচ্ছন্ন অবকাশ পায়। কিন্তু সে কথা শোনে কে?

অতএব মাসান্তে দর্শনকে ইলেকট্রিকের বিল্‌টা মিটিয়ে দিতে হচ্ছে।

এমনি আরো তা'র নিতে হয়েছে ছোটখাটো খরচের ভার। যা-কিছুর সঙ্গে ইন্দ্রাণীর কোনো প্রত্যক্ষ সম্পর্ক আছে, তা'তেই তা'র খাজনা লাগছে। যেমন ধরো চা, যেমন ধরো ধোপা। একবেলায় কুলোয় না, অনেক ঘোরাঘুরি করে' বিকেলেও সে আরেকটা টিউসানি নিলে। সব মিলে টাকা ষাটেকে এসেছে। তেমন টাকা আগে তা'র কতোদিকে যে মশা-মাছির মতো উড়ে গেছে আদাড়ে-বাদাড়ে, তা সে এখন ভাবতে পারছে না: এখন প্রতিটি পয়সার উপর তা'র অবিচল মায়া। আগে-আগে নিজের যা কিছু রোজগারি পয়সা দুই হাতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দিয়েও মোটা-মোটা দরকারি জিনিসের জন্যে দাদাদের কাছে সে হাত পাততো: যেমন কাপড় বা জুতো, কোথাও যেতে হ'লে যেমন রাহা-খরচ। আজ সে-দাবি মুখ ফুটে উচ্চারণ করাও তা'র মহাপাপ—সে বিয়ে করেছে। রোজগার করুক বা না করুক, সে বিয়ে করেছে। বিয়ে তা'র কেউ দিয়ে দেয়নি, মনে থাকে যেন, বিয়ে সে করেছে। তা'র দায়িত্ব আর কেউ নিতে আসছে না। এখন হ'তে সে একা।

হঠাৎ সমস্ত সংসার থেকে সে কী করে' যে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে গেলো, জীবনের এই বিস্ময়কর পরিবর্ত্তনটাই দর্শনকে অভিভূত করছে। আগে সে দাদাদের উপর খানিকটা নির্ভর করে' ছিলো, এখন তাঁরা রশিটা তা'কে অনেক দূর ছেড়ে দিয়েছেন। তা'কে নিয়ে আর যেন তাঁদের দুশ্চিন্তা নেই, নেমে গেছে তাঁদের সকল দায়িত্বের বোঝা। তা'র যে ভালো দেখে একটা চাকরি পাওয়া দরকার সে-বিষয়েও এখন থেকে তাঁরা শৈথিল্য দেখাতে

স্বরু করেছেন : যা পারো, নিজে জোগাড় করো গে, যাও। অথচ বিয়ের আগে পর্য্যন্ত তাঁরা তা'র একটা চাকরির জন্যে কী অক্লান্ত চেষ্টা করেছেন! তা'র একটা অর্থকরী ব্যবস্থা না হওয়া পর্য্যন্ত যেন তাঁদের পেটের ভাত হজম হচ্ছিলো না। এখন, এই বিয়ে করার পর থেকেই, তাঁরা চুপ। যা পারো, নিজে জোগাড় করো গে, যাও। বিয়ে করে'ই সে যেন একটা জমিদারি পেয়ে গেছে। আগে এ বাড়িতে তা'র বিস্তৃত জায়গা ছিলো, ছিলো যা খুসি করবার একটা স্বাধীনতা : এখন আরেকজনকে জায়গা করে' দিতেই তা'র স্থান হ'য়ে এসেছে সঙ্কীর্ণ, অধিকার সঙ্কুচিত। অথচ সেদিনকার সেই দর্শনের সঙ্গে আজকের এই দর্শনের কোনো তফাৎ নেই : আজো সেই মা'র ছেলে, দাদাদের সহোদর ভাই। মাঝখান থেকে আরেকজনের আবির্ভাবে দাঁড়িপাল্লা গেছে উল্‌টে, তা'র দিকটা হ'য়ে পড়েছে ভারি। অথচ, সেই আরেকজনের খাওয়া-পরার একটা দাম দিলেই চল্‌বে না, সঙ্গে-সঙ্গে জোগাতে হ'বে তা'র নিজেরো মাশুল। আগে তা'কে সাহায্য করা হয়েছে, এখন করতে হ'বে তা'কে সাহায্য। চাকরি পাক্ বা না পাক্, মনে থাকে যেন, বিয়ে করেছে সে।

অথচ এই কতোগুলি টাকা সে কী করে' উপার্জ্জন করছে, কতো টাকাই বা সে পায়—এ সব জানতে কারুর মাথাব্যথা নেই। আরো বেশি সে সংসারে দিতে পারে না কেন—সকলের হালচালে বরং সেই প্রচ্ছন্ন অভিযোগ। ইন্দ্রাণীর হাত লেগে মেজোবৌদির সেই দামি ফুলদানিটা টেব্‌ল্ থেকে পড়ে' সেদিন ভেঙে গেলো—আরেকটা তেমনি সেখানে কিনে এনে বসালে

ভালো হ'তো: কিন্তু দর্শনের ফুলদানি কেনবার পয়সা নেই, ইন্দ্রাণীর জমানো যা-কিছু পুঁজিও এতোদিনে নিঃশেষ হয়েছে। পয়সা যখন নেই, তখন, কাজেকাজেই দিতে হ'বে শ্রম, সইতে হ'বেই একটু অবজ্ঞা। সেই সব ব্যঙ্গোক্তিতে যদি দর্শনের আত্মদর্শন ঘটে, যদি বাড়ে তা'র একটু দায়িত্বজ্ঞানের তীব্রতা।

কিন্তু জ্ঞানের তীব্রতা বাড়লে কী হ'বে, এদিকে চাকরির সম্ভাবনাটা বিন্দুতম একটা তারার চাইতেও দূরে। বল্‌তে কি, বিয়ে করার আগেই যেন দর্শন ভালো ছিলো: তেমনি অনেক জায়গা জুড়ে গা ঢেলে বিশ্রাম, তেমনি চায়ের কাপে মৃদু-মৃদু চুমুক দেবার মতো মিঠে-মিঠে প্রেম। অলস অবসরে বেশ একটি কোমল কবিতা। এতো তীব্রতায় যেন সুখ নেই: দর্শনের সেই ধাতই নয়। নিজের উপর অবিশ্বাসী থেকে সময়ের স্রোতে গা ছেড়ে দিয়ে ঢেউ গুন্‌তেই সে ভালোবাস্‌তো। তা'কে ইন্দ্রাণী কিনা ডাক দিয়ে নিয়ে এলো চেতনার এই উত্তাল মহাসমুদ্রে। তা'কে সে দেবে না আর ঢেউ গুনতে। আরাম করে'-করে' তা'র শরীরে-মনে যে একটি অভিজাত নির্জীবতা এসেছিলো তা দেবেই সে খণ্ড-বিখণ্ড করে'। ইন্দ্রাণীর কাছে তা'র বড়ো সার্টিফিকেট—সে পুরুষ। কিন্তু আজকাল পুরুষদেরই যে চাকরি জোগাড় করা একটা প্রকাণ্ড সমস্যা, সে-কথা ইন্দ্রাণী বুঝেও বুঝবে না কিছুতেই। তা'র চেয়ে, চেষ্টা করলে, আরেকটা বিয়ে করা সহজ।

তবু, যা হোক্‌, সকালে-বিকেলে দু'টো টিউসানি করে' খানিক সে বর্তে' গেছে। তা'র হ'য়ে ইন্দ্রাণীই বিজ্ঞাপন দেখে-দেখে

জায়গায়-বেজায়গায় দরখাস্ত পাঠায়: ইন্দ্রাণীকে দিয়েই পাঠায়, কেননা, তা হ'লে সে বুঝতে পারবে চাকরির বাজারটা প্রেমের বাজারের মতো অতো সস্তা নয়। সে নিশ্চেষ্ট হ'য়ে আছে এমন কথা ইন্দ্রাণী তা'কে বলতে পারবে না। তা'কে আর সে গদাইলস্করি চালে চলতে দিলো কই? গাফিলি করে' সময় কাটাবার আমিরি করা আর তা'র পোষালো না, কিন্তু মাগ্‌গি-গণ্ডার দিনে জুৎসই চাকরিই বা কই একটা মিলছে!

মেঝের উপর বিছানাটা পাততে-পাততে হঠাৎ ইন্দ্রাণী স্থঁচ-স্থতো নিয়ে চাদরটা সেলাই করতে বস্‌লো। টিউসানি সেরে দর্শন ঘরে ফিরেছে: চোখের দুর্ব্বল দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করে' ইন্দ্রাণীকে স্থঁচে স্থতো পরাতে দেখে সে আধো-ঠাট্টায়, আধো-ভালোবাসায় বলে' উঠলো: কেমন, আমাকে আরো বিয়ে করো!

ইন্দ্রাণী খুসিতে ঝল্‌সে উঠলো: কেন, কী এমন অপরাধ করে' ফেলেছি।

বিকেলের ছাত্রকে সে আজ কোনোরকমেই সায়েস্তা করতে পারে নি, বকে'-বকে' সে হায়রান্‌। নিতান্তই মাসান্তে একটা টাকা পাওয়া যায় বলে' সোজা সে তা'র মুখের উপর একটা চড় বসায় নি যা-হোক্‌: এমন দর্শন যে দর্শন, তা'র পর্য্যন্ত ধৈর্য্যচ্যুতি হ'বার জোগাড়, পেছনে ইন্দ্রাণীর প্রয়োজনের তাগিদ না থাকলে আজই সে মাষ্টারিতে সটান ইস্তফা দিয়ে আস্‌তো। কিন্তু প্রেম যাকে করতে হয়, তা'র অসহিষ্ণু হ'লে চলে কী করে'?

ই ন্দ্রা ণী

গায়ের জামাটা খুলে ফেলে দর্শন একটা চেয়ারে এসে বস্‌লো। বল্‌লে,—একশোবার অপরাধ করেছ। আমাকে বিয়ে করা তোমার উচিত হয় নি।

ইন্দ্রাণী ঠাট্টা করে' বল্‌লে,—বা, তুমি তো ভা—রি! একলা কেবল আমারই দোষ, না? তোমার বুঝি আগাগোড়া 'ধরো-লক্ষ্মণ' ভাব। বাজনার বেলায় বেচারি ছড়টারই দোষ, বেহালার কোনো সায় নেই। বা, আছ বেশ।

—না, আমি তোমার কোনো অংশেই যোগ্য ছিলাম না। আমাকে না বিয়ে করে' তোমার অন্য জায়গায় যাওয়া উচিত ছিলো—এ আমি তোমাকে কী বিশ্রী আবহাওয়ার মাঝে নিয়ে এলাম।

—উঃ, তুমি কী ভীষণ সেন্টিমেণ্ট্যাল্। তোমাকে নিয়ে আমার কী উপায় হ'বে?

—না ইন্দ্রাণী, সত্যি কথাই বল্‌ছি। এসব কুৎসিত দুঃখ তোমাকে মানায় না, এ সবের জোয়াল টান্‌তে তুমি জন্মাওনি।

ইন্দ্রাণী খিলখিল করে' হেসে উঠলো। বল্‌লে,—তুমি আমাদের সুখের কী বুঝবে? তুমি গরিব তো আমার তা'তে বয়ে' গেছে। তুমি মাত্র গরিব বলে' তো নিজেকে এই সার্থকতা থেকে বঞ্চিত করতে পারি না।

—সার্থকতা না হাতি! দর্শন অস্থির হ'য়ে উঠলো: আমার এ-গরিবানায় কোনো মাহাত্ম্য নেই।

—তোমার এ চাঞ্চল্য দেখে আমার কিন্তু একটু আশা হচ্ছে। চোখ তুলে ইন্দ্রাণী বল্‌লে,—কিন্তু কী তুমি করতে

পারো? আমাকে ভালোবাসা ছাড়া আর তোমার কী করবার আছে?

শরীরে একটা দৃঢ় ভঙ্গি এনে দর্শন বল্‌লে—না, মার্চেণ্ট অফিসের সেই চাকরিটা আমাকে নিতেই হ'চ্ছে। পঁয়তাল্লিশ টাকা মাইনে, তারপর টিউশান দু'টো যোগ দিলে একরকম মন্দ হ'বে না।

তা'র ক্লান্ত মুখের দিকে চেয়ে ইন্দ্রাণী বল্‌লে,—তাতে কী হ'বে?

ইন্দ্রাণী সারা দিনের পরিশ্রমের পর এখন শয্যাসংস্কারে মনোনিবেশ করেছে; এখনো তা'র বিকেলের গা ধোয়া হয় নি, গায়ে আঠার মতো লেগে আছে ক্লান্তির কালিমা। শরীরের নরম রেখাগুলি অবসাদে শিথিল, অপরিচ্ছন্ন শাড়িটি গায়ে ফেলেছে বিষাদের ছায়া। ম্লান, স্নিগ্ধ চোখে তা'কে লেহন করে' দর্শন বল্‌লে,—দারিদ্র্যটা তা হ'লে আরো একটু ভদ্রতরো হ'তো। তোমার চেহারার এ বৈধব্য দেখলে আমার গা জ্বালা করে। গায়ে একটা ভালো তোমার গয়না নেই, কী কতোগুলি কস্তাপাড় শাড়ি ছাড়া তোমার শাড়ি নেই।

—রামচন্দ্র! ইন্দ্রাণী বিছানা শেষ করে' উঠে দাঁড়ালো: পরের কাছে নিজের জিনিসটির একটা জাঁকালো বিজ্ঞাপন দিতে না পারলে বুঝি মশায়ের মন ওঠে না। নাঃ, তুমি দেখছি একেবারে পিউরিট্যান্, যাকে বলে hostile to life, যাকে বলা যায় immoral। আমার ক'গাছ চুড়ি আর ক'প্রস্ত শাড়ির জন্যে তোমার একটা জঘন্য কেরানিগিরি নিতে হ'বে। মাগো, শেষ

কালে একটা কেরানির বৌ বলে' পৃথিবীতে চলে' যাবো। দরকার নেই আমার গয়নাগাটিতে—এই আমি খাসা আছি।

—খাসা আছ—একটা প্রাইভেট-টিউটারের স্ত্রী হ'য়ে।

—মোটেই নয়, হিস্ট্রিতে ফার্স্ট্ ক্লাশ ফার্স্ট্ সুদর্শন সেনের জীবনসঙ্গিনী হ'য়ে। এখনো তুমি তাই আছ, ইন্দ্রাণী হেসে উঠ্লো : খবরদার, যা-তা চাকরি নিয়ে বসো না।

—কিন্তু, মুখ গম্ভীর করে' দর্শন বল্লে,—এমনি করে' ক'দিন থাকা যায় ?

—কী এমন তুমি কাঁটার ওপর বসে' আছ শুনি ? **Wait and try.** কোনো কলেজে একটা ভেকেন্সি হ'য়ে গেলেই পেয়ে যাবে এবার।

—আর-জন্মে। ততোদিন এখানে, এ-বাড়িতে থাকি কী করে' ? ছেলে-পড়ানোর চাইতেও **depressing atmosphere**। দর্শন চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো : তুমিই বা এখানে কী করে' টিঁকে আছো ? দিনের পর দিন এ তোমার ভালো লাগে ?

—কী ?

—এই উনুন ধরানো, ঘর ঝাঁট দেয়া, কাঁথা-কাপড় কাচা, এই একঘেয়েমি ?

—বা, উনুন না ধরালে খাবে কী, ঘর ঝাঁট না দিলে শোবে কোথায়, রোজ ফতুয়াটা অন্তত না কেচে দিলে নিজেরই তো ঘিনঘিন করবে। একঘেয়েমি ? ইন্দ্রাণী ঘাড় হেলিয়ে গালের আধখানায় হাসির একটি হালকা ঢেউ তুললে : দিনের একঘেয়েমির শেষে, তারপর আমার তুমি আছ না ?

—না ইন্দ্রাণী, তুমি কি এই সব তুচ্ছতার জন্যে জন্মগ্রহণ করেছিলে নাকি?

—বা রে, তবে আবার কিসের জন্যে? ইংরিজি ক'পাতা পড়তে পারি বলে' আমার কী এমন ল্যাজ গজিয়েছে। পাশ কয়েকটা করেছি বলে' তো আমি আর আকাশে উড়তে শিখিনি।

—না, এরকম করে' তুমি নিজেকে চোখ ঠেরো না। তোমাতে আর মেজবৌদিতে কোনো তফাৎ নেই যদি তুমি বুঝতে শেখ ইন্দ্রাণী, তা হ'লে বুঝতে হ'বে বিয়ের পর তুমি তোমাকে হত্যা করেছ।

—সর্ব্বনাশ! ইন্দ্রাণী জোরে হেসে উঠলো: একেবারে হত্যা!

গলা নামিয়ে দর্শন বল্‌লে,—আস্তে। তুমি যে উচ্চকণ্ঠে হাসবে, এ-বাড়িতে তা-ও একটা প্রকাণ্ড অপরাধ। হত্যা হয়তো তুমি তোমাকে করো নি, করেছি আমি। আমিই তোমাকে—

—**Please.** দয়া করে' ঐ হত্যা কথাটা ব্যবহার করো না। ভীষণ **harrowing**।

—না, দর্শন পাইচারি করতে-করতে বল্‌লে,—চলো, এ-বাড়ি ছেড়ে আমরা পালাই।

—কোথায়?

—পৃথিবীতে জায়গা একটা পাওয়া যাবেই।

—সেখানে গিয়ে আমাদের কী করতে হ'বে? ইন্দ্রাণীর ঠোঁট ঠাট্টায় ঈষৎ বাঁকানো।

দর্শন হঠাৎ তা'র একখানা হাত চেপে ধরলো: না, তুমি চলো।

স্বামীর স্পর্শের আশ্রয়ে সরে' এসে ইন্দ্রাণী বললে,—আমার এই অপদার্থ স্বামীটিকে আরামের এই আশ্রয় ছেড়ে কোথায় নিয়ে যাবো? এখানে তবু তোমার মা আছেন, full brotherরা আছেন, ঘরের ওপর তবু একটা চাল আছে, রান্নাঘরে চুলো আছে—সেখানে যে একেবারে খোলা, ঝোড়ো আকাশ। স্বামীকে গায়ের উপর গাঢ় করে' টেনে এনে ইন্দ্রাণী তা'র কপালে হাত বুলুতে-বুলুতে বল্‌লে,—পৃথিবীতে জায়গা সত্যিই বেশি নেই।

—কিন্তু তোমার এই দুর্দ্দশা আমি আর দেখতে পারি না, তুমি যেন কী হ'য়ে গেছ। রান্নাবান্না ছাড়া আর কোনো বড়ো কাজ যদি তোমার দ্বারা সম্ভব না হয়—

মুখের কথা মুখ দিয়ে কেড়ে নিয়ে ইন্দ্রাণী বল্‌লে,—স্বামী ও গুরুজনদের সামনে ভাত বেড়ে থালা ধরবার চেয়ে মেয়েদের আর কোনো বড়ো কাজ আছে নাকি? ইন্দ্রাণী ঝরঝর করে' হেসে ফেল্‌লো: বলো, 'তোমাকে আমি হত্যা করেছি।' হত্যা করতেই তো তুমি আছ। পরে দর্শনের চুলের মধ্যে আঙুল বুলোতে-বুলোতে সে আর্দ্র কণ্ঠে বল্‌লে,—এতো অস্থির হ'য়ে কী করবে? Wait and hope. দু'দিনে সব ঠিক হ'য়ে যাবে। পুরুষ মানুষ, একটা তুমি চাকরি পাবে না ভেবেছ? আমার জন্যে কিছু ভেবো না। I'm game.

আট

দর্শন সৌদামিনীর কাছে গিয়ে বল্‌লে,—ইন্দ্রাণীর চোখটা বিশেষ ভালো নয়, ক'দিন থেকে ভীষণ জ্বালা করছে। সমানে মাথা ধরে' আছে বলছে।

সৌদামিনী তরকারি কুট্‌ছিলেন ; নির্লিপ্তের মতো বল্‌লেন,—তা আমি কী করবো ? ডাক্তার দেখালেই হয়।

—ডাক্তার দেখিয়েছি, মা।

—তা আর দেখাবে না ! বাবু বৌ ঘরে এনেছ, কথায়-কথায় ডাক্তার না দেখালে চলবে কেন ?

—চোখটা ওর অনেক কাল থেকেই খারাপ, দর্শন বল্‌লে,—পরীক্ষা করে' দেখা গেলো চশমার পাওয়ার্‌ ওর আরো অনেক বেড়ে গেছে।

—চোখ খারাপ, তবু চোখের মাথা খেয়ে তো গিয়েছিলে ওকেই পছন্দ করতে। হাতের কুমড়োটায় ফালা দেবার সঙ্গে-সঙ্গে সৌদামিনী জোর দিয়ে বলে' উঠলেন : পাওয়ার্‌ বেড়ে গেছে, আবার সোনা দিয়ে চশমা গড়িয়ে দাও।

—চশমা বদ্‌লে আনা হয়েছে, কিন্তু, দর্শন ঢোঁক গিলে বল্‌লে—ডাক্তার বলে' দিলে যে উনুনের সামনে ঐ চোখে রান্না করাটা ঠিক হ'বে না।

সৌদামিনী গম্ভীর মুখে বল্‌লেন,—ঠিক হ'বে না তো বৌ-র বদলে একটা ঠাকুর রেখে দিলেই পারো।

দর্শন বল্‌লে,—তাই রাখবো ভাব্‌ছি।

—কিন্তু আমার পাকে কে রাঁধবে?

—বৌদিদিদের কাউকে রাঁধতে হ'বে আর-কি। ইন্দ্রাণীর এ-বাড়িতে আসবার আগে ওঁরাই তো ঘুরে-ঘুরে রান্না করতেন। উপায় কী তা ছাড়া।

—না, উপায় কী! সৌদামিনী পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে বল্‌লেন,—তুমি তোমার সোহাগিনী বৌকে আড়াল করে' থাকবে, আর উনুনের মুখে ঠেলে পাঠাবে ঐ পোয়াতি বৌদের। দেখাদেখি তা'রা আবার মুখ বেঁকালে শেষকালে বুড়ো বয়সে আমাকেই গিয়ে হাঁড়ি ঠেলতে হ'বে আর-কি। সেই যে কী বলে না, মায়ের গলায় দিয়ে দড়ি, বৌকে পরায় ঢাকাই শাড়ি—এখন হয়েছে সেই দশা।

—বা, অসুখ করলে কী করা যাবে, মা? দর্শন রুক্ষ কণ্ঠে বল্‌লে,—উনুনের আঁচে চোখ যদি ওর নষ্ট হয়, তবে তাই কি হ'তে দিতে চাও নাকি তোমরা?

—না, না, আঁচ লাগবে কী! সৌদামিনী মুখ বেঁকিয়ে উঠলেন: তুলোর বাক্সে করে' প্যাঁটরার মধ্যে বৌকে ঢাকা দিয়ে রাখো গে যাও।

—বা, মাইনে-করা ঠাকুর রেখে দিয়েও রেহাই পাবো না, মা? দর্শন রীতিমতো রাগ করে' উঠলো: নিচের রান্নাঘরে ঠাকুর এসে গেলেই তো বৌদিদিদেরো ছুটি মিলে গেলো। তাঁরা একদিন করে' মাত্র একজনের জন্যে ওপরে তোমাকে রান্না করে' দিতে পারবেন না? ওর যখন অসুখ,—আর সকল কিছুর চাইতে মানুষের চোখই হচ্ছে মূল্যবান। ও যখন ছিলো না মা, তখন এক বৌদি নিচে, এক বৌদি ওপরে, এমনি অদলবদল করে' দু'বেলা রান্না করেন নি? এখন কি ওপরে তোমার জন্যেও আমাকে একটা বাম্‌নি রেখে দিতে হ'বে নাকি?

সৌদামিনী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বল্‌লেন,—আমার জন্যে! আমার জন্যে আবার বাম্‌নি! বলে, তপ্ত ভাতে নূন জোটে না, পান্ত ভাতে ঘি। থাক্, মা'র কাজ ঢের করেছ, এখন নিজের-নিজের কাজ গুছোও গে যাও।

বিকেল বেলা বাড়িতে এক ঠাকুর এসে হাজির দেখে আনাচ-কানাচ থেকে নানান রকম কোলাহল স্থরু হ'লো। নীরদা ইন্দ্রাণীকে ভাঁড়ার ঘরের মধ্যে টেনে নিয়ে বল্‌লে,—এ আবার তোমার কোন্ ফ্যাসান্?

ইন্দ্রাণী বল্‌লে,—কোন্‌টা?

—এই যে ঠাকুরপোকে দিয়ে একটা ঠাকুর ধরে' আনলে?

—আমি আনতে পাঠাবো কেন? ইন্দ্রাণী কথায় ঝাঁজ দিয়ে বল্‌লে,—তাঁর নিজের একটা কাণ্ডজ্ঞান নেই?

জুতোয় যেমন সুখতলা—তেমনি নীরদার পাশটিতে আছে নিভা। আগে অবিশ্যি, মানে ইন্দ্রাণীর আসবার আগে, দু'জনে

ছিলো সাপে বেজিতে : তা'দের যতো প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিলো নিজের-নিজের ছেলেপিলেদের লুকিয়ে বেশি খাওয়াবার ঘটায় ; একই দিনে কল্‌কাতায় তা'দের যার-যার বাপের বাড়ি বেড়িয়ে আসবার অদম্য উদ্যমে ; তা'দের নতুন ধাঁচের ছিট ও নতুন পাড়ের শাড়ি কেনবার উৎসাহে। নীরদার ঘরে যদি একটা ড্রেসিং-টেব্‌ল্ এলো, নিভার অমনি চাই একটা কাচের দরজাওয়ালা আল্‌মারি। নিভার যদি হ'লো একজোড়া দুল, নীরদা বয়সে একটু বুড়োটে হ'লে কী হ'বে, তারো চাই ঘোমটা আট্‌কাবার অন্তত দুটো সেফ্‌টিপিন্। এমনি বংশানুক্রমে। কিন্তু ইন্দ্রাণী আসবার সঙ্গে-সঙ্গেই তা'রা একদলে। বোতলের যেমন ছিপি, দরজার যেমন ছিট্‌কিনি—তেমনি নীরদার নিভা, একটা নির্ভর।

দিদির গা ঘেঁসে নিভাও একটু হেলান দিলো : রান্না করলে কি তোমার জাত যেতো ?

ইন্দ্রাণী হেসে বল্‌লে,—জাত তো কবেই গেছে। তা'র চেয়েও দামি জিনিস যেতো, আমার চোখ।

—উঃ, কতো ফুটুনি। নীরদা তা'র বাম অর্দ্ধাঙ্গে একটা মোচড় দিয়ে বল্‌লে,—কেউ আর কোনোকালে পড়াশুনো করে না! না হয় পাশই করি নি ফ্যাসান্ করে', কিন্তু তোমার চেয়ে বই কিছু কম পড়িনি আমরা। কই চারচোখও হইনি, উনুনের আঁচে চোখের ড্যালা দু'টোও গলে' যায় নি। বিদ্যের অতো দেমাক করো না আমাদের কাছে।

ইন্দ্রাণী বল্‌লে,—পড়াশুনো একদম না করে'ও অনেকের চোখ খারাপ হয়। অসুখ করলে সাবধান হওয়াটাও কি একটা ফ্যাসান্ ?

দিদির দেখাদেখি নিভাও একটা মোচড় দিলো : ঢং। আমরা অসুখ নিয়ে কতো কী কাজকম্ম করে' যাচ্ছি, কই, কেউ তো আমাদের হ'য়ে দরদ দেখাতে আসে না। চোখের চশমার জন্যে আবার ডাক্তার! আমাদের মাথা ভেঙে গেলেও তো একটা হাতুড়ে আসে না দেখি। বলে, ঘণ্টা বাজিয়ে দুর্গোৎসব, ইতু পুজোয় ঢাক।

ইন্দ্রাণী ঈষৎ তপ্ত হ'য়ে বল্‌লে,—কিন্তু দরদ তো একা আমারই ওপর দেখানো হচ্ছে না, রান্না থেকে আপনারাও তো সঙ্গে-সঙ্গে রেহাই পাবেন।

—মা'র রান্না?

—তা আমার হ'য়ে রাঁধ্‌লেনই বা। আপনাদের কারুর অসুখ করলে ছেলেপিলেদের আমার দেখাশোনা করতে হ'বে না? ইন্দ্রাণী বিরক্ত, ক্লান্ত গলায় বললে,—বাড়িতে সামান্য একটা ঠাকুর রাখা নিয়ে এতো যে হট্টগোল হ'তে পারে, তা কে জানতো? অথচ এর জন্যে সংসারের বিশেষ কিছু অসুবিধে হচ্ছে না। তা'র মাইনেটা তো উনিই দেবেন বলেছেন।

—কী আমার মাইনে-দেনে-ওয়ালা উনি রে! নীরদা একটা বেড়ালের মতো ফোঁস করে' উঠলো : বিদ্যের তো একটি চুড়ো, পেটের মধ্যে অনেক বই-খাতা তো শুনি গজ্‌গজ্‌ করছে, টাকার খোঁটা দিতে তোমার লজ্জা করলো না? সামান্য একটা ঠাকুরের মাইনে দেবে—তা-ও কতোদিন দিতে পারে দেখ—তায় আবার লম্বা-চওড়া কথা! দাদারা এতোটুকু থেকে মানুষ করলো, টাকা-পয়সার শ্রাদ্ধ,—তাই উপযুক্ত হ'য়ে সামান্য একটা ঠাকুরের মাইনে

দিতে যাচ্ছেন, তা'তে কথা শোনানো! কে তোমার ঠাকুর চায়—রেঁধোনা তুমি, তুমি না-রাঁধ্‌লে এ সংসার আর উপোস করে' শুকিয়ে মরবে না।

ইন্দ্রাণী নিঃসঙ্কোচে বল্‌লে,—টাকার আমি কোনো খোঁটা দিতে চাইনি, দিদি। বলছিলাম, এতে মিছিমিছি কোনো খরচ বাড়ছে না। তিনি পরে চাকরি করতে পেয়ে দাদাদের আরো সাহায্য করবেন নিশ্চয়—এখন যদ্দুর সাধ্যি—

—আর পেয়েছে! নিভা ঠোঁট উল্‌টোলো।

নীরদা হাত নেড়ে বল্‌লে,—আর এ তুমি কী বিদ্যানি হয়েছ যে রাঁধতে গেলে তোমার মান যায়। বিদ্যে বুঝি হয় ইস্কুলে-কলেজে গিয়ে ডিগ্‌বাজি খেলে, আত্মীয়-স্বজনদের জন্যে দু'টো ফুটিয়ে দিতে গেলেই বুঝি বিদ্যে যায় রসাতলে। ছাই, ছাই লেখাপড়া শিখেছ, তা নিয়ে অতো দাঁত বা'র করো না। কী বল্‌, নিভা, নীরদা নিভার কনুইয়ে একটা ঠেলা মারলো: আমরা অমন লোক-দেখানো পাশ-ফেল করিনি, কিন্তু বলতে গেলে ছোট বৌর চাইতে আমরা বেশি শিক্ষিত।

—তা কে অস্বীকার করছে? ইন্দ্রাণী বল্‌লে,—নিশ্চয়, আপনারা রাঁধ্‌তে পারেন, রান্নায় আপনারা দ্রৌপদী—

এবার নিভা মুখ নেড়ে বল্‌লে,—একশো বার। মেয়েদের শেখবার আসল বিষয়ই হচ্ছে এই রান্না, সেবা, শিশুপালন। রান্না একটা শিল্পবিদ্যা।

—আপনারা সেই বিদ্যা নিয়ে থাকুন, দেশের মুখোজ্জ্বল হোক্‌। ইন্দ্রাণী দীপ্ত কণ্ঠে বল্‌লে,—রান্না ছাড়াও যে মেয়েদের আর কোনো

বড়ো কাজ থাকতে পারে, আপাততো তা আপনাদের অজানাই থাকুক্। কোনো-কোনো সভ্য দেশে যে রান্নার কাজটা মিউনিসিপ্যালিটিই করে' দেয় তা জেনেও আপনাদের বিশেষ লাভ নেই।

ইন্দ্রাণী চলে' যাচ্ছিলো, নীরদা পিছন থেকে ঝঙ্কার দিয়ে উঠলো: কী আমার বড়ো কাজ করুনে-ওয়ালি এসেছেন! কাজের মধ্যে দেখি তো কেবল সোয়ামির বগল ধরে' হাওয়া খেতে যাওয়া।

এমনি ছোটখাটো ঝড়-ঝাপটা থেকে-থেকে বয়ে'ই চলেছে।

আরেক দিন।

সেদিন হঠাৎ দুপুরের খাওয়ায় কয়েকজন লোক বেড়ে গিয়েছিলো বলে' থালার টান পড়েছিলো ; বাসনের পাঁজায় চাকর এখনো হাত দেয় নি। সৌদামিনী বল্‌লেন,—তোমরা তিন জায়ে এক থালায় বসে' খাও না।

ইন্দ্রাণী গম্ভীর হ'য়ে বল্‌লে,—কারু সঙ্গে এক পাতে বসে' আমি ভাত খাই না।

—কেন, কী দোষ?

—খাই না, ও আমার অভ্যেস নেই।

—অভ্যেস নেই মানে? সৌদামিনী জোর দিয়ে বল্‌লেন,—অভ্যেস তোমায় করতে হ'বে।

—না, কথায় জোর দিতে ইন্দ্রাণীও জানে: যা স্বাস্থ্যের বিরুদ্ধে, তেমন কাজ আমি সজ্ঞানে করতে পারবো না।

নিভা তো অবাক : ভাত খাওয়া স্বাস্থ্যের বিরুদ্ধ? এ যে দিদি, নতুন কথা শুনছি।

—ভাত খাওয়া নয়, ইন্দ্রাণী বল্‌লে,—কারুর সঙ্গে একথালায় বসে' ভাত খাওয়া। কা'র কী রোগ আছে কে জানে?

এক মুহূর্ত্তে সবাই স্তব্ধ হ'য়ে গেলো। সৌদামিনী বল্‌লেন,—কা'র আবার কী রোগ থাকবে? আমরা তো ছেলেবেলা থেকেই সবাইর সঙ্গে একসাথে বসে' খেয়ে আসছি—কোনোদিন তো রোগ হ'তে দেখলাম না। আমরা তোমার মতো এমন নিজের সুখ বুঝতে শিখিনি, পাঁচজনের সঙ্গে মিলে-মিশেই আমরা ঘর করে' এসেছি। কী আমার রূপের ডালি, তায় আবার রোগ—রোগের চিন্তা!

ইন্দ্রাণী শান্ত গলায় বল্‌লে,—কেবল নিজের সুখের জন্যেই বলছি না মা, সকলের ভালোর জন্যেই বলছি। বড়-দির দাঁত যে খারাপ সে তো সবাই জানে, আর মেজ-দির আছে হিষ্টিরিয়া—

—হিষ্টিরিয়া? তা'কে তুমি হিষ্টিরিয়া বলো? নিভা গর্জ্জে' উঠলো : আর তোমার যে চোখ নেই, তুমি যে কাণা—

—সেই জন্যেই তো বলছি আমার সঙ্গে আপনাদের কারুর খাওয়া ঠিক হ'বে না।

নীরদা মুখ ঝাম্‌টা দিয়ে উঠলো : হেনস্তা, হেনস্তা—এ কেবল আমাদের হেনস্ত করা। উনি কী ছাই ক'টা পাশ করেছেন বলে' একেবারে রাণী ভিক্টোরিয়া হয়েছেন! হ'বে না, খেতে হ'বে না আমাদের সঙ্গে—তবু যদি বুঝতাম নিজেদের খাওয়াটা জোগাড় করবার কোনো মুরোদ আছে।

ইন্দ্রাণী রাগ করে' উপরে চলে' গেলো—ননদরা এলো সাধাসাধি করতে। ইন্দ্রাণী বল্‌লে,—আমার ভাত ঢেকে রাখতে বলো গে, নিচেটা একটু নিরিবিলি হ'লে এক সময় গিয়ে খেয়ে আসবো 'খন।

ঘোলাটে আবহাওয়ায় পড়ে' ইন্দ্রাণীরো মনের রঙ মেটে হ'য়ে যাচ্ছে দিন-দিন। যে-আকাশ এরা সঙ্কীর্ণ করে' রেখেছে, তারো জীবনের যেন ততোটুকু পরিধি। সে এদেরই মতো রান্না করে, ঘর নিকোয়, পরিপাটি করে' বিছানা পাতে। এদেরই মতো সাজসজ্জা, নিজের স্বামী। বোঝে শুধু পয়সা নিয়ে কদর্য্য কার্পণ্য : মিতব্যয়িতার নামে চিত্তের দরিদ্রতা। শিখে উঠেছে সে খুঁটিনাটি ঝগড়া করতে, ঠোকর দিয়ে কথা কইতে, অভিমানে মুখ ফুলোতে। খাঁচার মধ্যে ঢুকে পড়ে' সেও স্তব্ধ করে' আনলো তা'র পাখা, ছোট করে' আন্‌লো তা'র বাতায়ন। তা'র মনে ধরেছে মর্চে, সেই তা'র তলোয়ারের ফলার মতো ঝক্‌ঝকে মন : তা'র শরীরে ধরেছে ঘূণ, সেই তা'র মননশক্তিতে উজ্জ্বল, উদ্ধত শরীর। নিজের জন্যে নিজেরই তা'র ভারি মায়া করতে লাগলো: এ সে কী হ'তে বসেছে!

কিন্তু চেয়ে আছে সে দর্শনের দিকে যাকে নিয়ে তা'র জীবনের স্বপ্ন ও জীবনের সার্থকতা। যে তা'কে নিয়ে যাবে সংসারের ঊর্দ্ধে আকাশের পরিব্যাপ্তিতে, বিপুলতরো ভবিষ্যতের অতলতায়। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত, এতো ঘোরাঘুরি করে'ও দর্শন একটা চলনসই চাকরি জোগাড় করতে পারলো না। ইন্দ্রাণীর বুঝতে আর বাকি নেই, সংসারে কিছুরই কোনো দাম নেই—প্রতিভা বলো, প্রেম

বলো, সবাইর মূলে চাই সেই টাকা, যার রসগ্রহণে সবাই সমান পারঙ্গম। টাকার জোরে নয়কে হয় করে' দেয়া যায়, বিসদৃশকে করে' তোলা যায় সুসমঞ্জস। দর্শনের যদি টাকা থাকতো, তবে তা'র এই প্রেম হ'তো একটা কীর্ত্তি: ইন্দ্রাণীর যদি থাকতো টাকা, তবে তা'র প্রতিভা হ'তো একটা সৌন্দর্য্য। টাকার অতিরিক্ত আর যেন কিছু বিত্ত নেই, অন্তত যেখানে তুমি পাঁচজনের সঙ্গে সমাজ গঠন করে' আছ—টাকাই সেখানে একমাত্র অস্ত্র, টাকাই সেখানে তোমার একমাত্র সংজ্ঞা। যেন তা'র প্রেমের প্রবলতা নিরূপিত হ'বে দর্শনের অর্থোপার্জ্জনের ক্ষমতা দিয়ে, যেন সে তা'র আত্মবিকাশের প্রেরণা লাভ করবে এই অর্থোপার্জ্জনের অসুস্থ উন্মত্ততা থেকে। যেন এই তা'র অতিকায় অহঙ্কার।

ইন্দ্রাণী মমতায় স্নিগ্ধ চক্ষু তুলে দর্শনের মুখের দিকে চেয়ে থাকে। দর্শন প্রয়োজনানুরূপ টাকা রোজগার করতে পারে না—সে যেন ইন্দ্রাণীর কাছে কী ভীষণ অপরাধ করে' আছে। তা'র ব্যবহারে সেই গ্লানি, সেই তেজোহীনতা। রাত্রে ইন্দ্রাণীর প্রত্যাশার উত্তাপে বিশ্রাম নিতে এসেও সে বিষণ্ণ, দুর্ব্বল: টাকা যখন রোজগার করতে পারছে না, তখন স্নেহেও তা'র অধিকার নেই। সমস্তক্ষণ দর্শন যেন এই লজ্জায় লাঞ্ছিত হচ্ছে। ইন্দ্রাণী তা'কে স্পর্শে, হাসিতে, শব্দে, সৌরভে উচ্চকিত, উন্মুখর করে' তুলতে চায়, কিন্তু ইন্দ্রাণীর চেয়েও বড়ো তা'র টাকা: টাকা না পেলে সে যেন একদিন ইন্দ্রাণীরো আর দাম দিতে পারবে না। ইন্দ্রাণীকে যদি সে হত্যা করে' থাকে, তবে তা'র জীবনে ইন্দ্রাণী এনেছে এই হননের বিভীষিকা।

কিন্তু তাই বলে' কি তা'দের মুক্তি নেই? ইন্দ্রাণীর একেক সময়ে ইচ্ছা হয় দর্শনকে নিয়ে সে বাইরে বেরিয়ে পড়ে—বৃহৎ একটা বিস্তারের মধ্যে। কিন্তু ভয় হয়—ভয় হয় স্বামীর এই অতিকোমল নির্ভরশীলতাকে, ভয় হয় তা'দের ঘিরে সম্পূর্ণ, পরিব্যাপ্ত নিঃশব্দতার ভাবকে। দর্শন এখানে এই পরিবারের এতো গভীরে তা'র শিকড় প্রসারিত করে' দিয়েছে যে তা'কে সমূলে উপড়ে নেয়া প্রায় অসম্ভব; তবে দারিদ্র্যের কুঠারের ঘায়ে-ঘায়ে সে-শিকড়গুলি হয়তো এতোদিনে প্রায় আলগা হ'য়ে এসেছে। আসবার তো কথা, কিন্তু দর্শনকে তবু তা'র ভয় করে, —ভয় করে তা'র ভাবপ্রবণ অলস নিশ্চেষ্টতাকে: তা'র চরিত্রে রয়েছে দুর্ব্বল আত্ম-অবিশ্বাসের নেশা। তা'র দ্বারা কিছু হ'বে না, এই একটা অসুস্থ চিত্তবিক্ষেপ। এই অকর্ম্মণ্যতাই তা'র বিলাস, তা'র কৃতিত্বের পরিচয়। দারিদ্র্যকে সে পাপ বলে' ধরে না, দেয় তাকে একটা ব্যর্থতার সৌরভ, কবিতার আবহাওয়া।

তবু ইন্দ্রাণী তা'কে একদণ্ডও ভোগ করতে দেবে না এই মদির তন্দ্রালস্য। তা'কে চেতনার ঢেউ থেকে ফেনিলতরো ঢেউয়ের উপর নিয়ে আসে। বলে: ওটা না হয়েছে, তুমি সেই ইন্‌সিয়োর কোম্পানির চাকরিটার জন্যে চেষ্টা করো। মিঃ রায় আমাকে খুব স্নেহ করতেন, তাঁর মেয়ে প্রতিমার সঙ্গে কতোদিন ওঁর বাড়ি গিয়ে গান গেয়ে এসেছি। আমি ওঁকে একটা চিঠি লিখে দেবো। তুমি কিছু ভেবো না, সব ঠিক হ'য়ে যাবে।

নয়

ঠিক কিছুই হ'লো না, মাঝের থেকে দর্শনের বিকেলের টিউসানিটা হাতছাড়া হ'য়ে গেলো। পকেটে টান পড়লো বটে, কিন্তু যে-দায়িত্ব দর্শন একবার হাতে নিয়েছে তা সে কিছুতেই ছাড়তে পারবে না—অসম্ভব সে-পরাজয় বহন করা। তা'কে দিতেই হ'বে ইলেকট্রিকের বিল্‌, ঠাকুরের মাইনে, চায়ের খরচ, কয়লার দাম—যা পড়েছে তা'র ভাগে। কিন্তু মনের সদিচ্ছায় কী কাজ হ'বে বলো ?

এবার ইন্দ্রাণী এলো এগিয়ে। বল্‌লে,—তোমার ব্যস্ত হ'তে হ'বে না। আমি চাক্‌রি করবো।

—তুমি ?

—হ্যাঁ, তুমি শুধু খেটে দেহপাত করবে, আর আমি গা ছড়িয়ে শুয়ে আরাম করবো, এমন কোনো বাঁধাধরা কথা নেই। ইন্দ্রাণী দৃঢ় গলায় বল্‌লে,—বরং তোমার সঙ্গে চুক্তি ছিলো আমার উল্‌টো। মনে পড়ে না সেই চাওউয়ার কথা ?

ম্লান চোখে দর্শন বল্‌লে,—তুমি চাকরি করবে কী, ইন্দ্রাণী ?

—বসে'-বসে' অভাবের দংশন সহ্য করবো, অথচ ক্ষমতা থাকতে তা ব্যবহার করবো না—তুমি কি আমার এই অপমরণ দেখতে চাও নাকি? ইন্দ্রাণী তা'র দুই গাঢ় নির্নিমেষ চোখ দর্শনের মুখের উপর তুলে ধরলো: আমাদের এই মিলনের দায়িত্ব কি একলা তোমার? আমার যেটুকু শক্তি আছে তা দিয়ে যদি তোমার ক্ষতিপূরণ না করতে পারি তো আমি—আমি তোমাকে কেন ভালোবাস্‌লাম? আমি তোমার পাশে দাঁড়াতে চাই, তোমার কাঁধে ভূত হ'য়ে চেপে বসে' থাকতে চাই না।

যেন ভয়ে-ভয়ে দর্শন জিগ্‌গেস করলে: কী চাকরি তুমি করবে?

ইন্দ্রাণী বল্‌লে,—তা'র জন্যে তোমার ভাবতে হ'বে না। গেলো-সপ্তাহে ষ্টেট্‌স্‌ম্যানে এক বিজ্ঞাপন দেখেছিলাম—দু'টি বাঙালি মেয়ের জন্যে গানের এক মাষ্টারনি চায়। সপ্তাহে তিন দিন—রবিবার বাদ—বিকেলে দু' ঘণ্টা, মিনিমাম্‌ মাইনে কতো চাই জানিয়ে apply করতে হ'বে। আমি কম করে' পঞ্চাশ টাকা বলে' দরখাস্ত করে' দিয়েছিলাম। কাল তা'র জবাব এসেছে, দেখবে? ইন্দ্রাণী দেরাজটা টানতে-টানতে বল্‌লে,—হ'য়ে গেছে আমার সেই চাকরি। বেশি দূরে নয় তা'দের বাড়ি—এই গড়পার। আমার নাম শুনেই নাকি মেয়ে দু'টি আমাকে রাখবার জন্যে পাগল। তুমি জানো তো এককালে songstress হিসেবে আমি কী rage ছিলাম। তুমি তো নিরালায় বসে' একদিন আমার গান শুন্‌লেও না—এই দেখ চিঠি। কী? পঞ্চাশ টাকা! এমন কিছু খারাপ বলে' মনে হচ্ছে?

ই ন্দ্রা ণী

পঞ্চাশ টাকা! তা-ও সপ্তাহে মাত্র তিন দিন, দু'ঘণ্টা করে'। আবহাওয়াটা কেমন হাল্‌কা, মুহূর্ত্তগুলি কেমন মিঠে। দু'ঘণ্টা দেখতে-দেখতে যাবে কেটে। দর্শন বিকেলে যেই টিউসানিটা করতো—তা সপ্তাহে প্রত্যহ, রবিবারে আসতে পারলেও ভালো হ'তো, ঘড়ি ধরে' দু'ঘণ্টা না কেটে গেলে তা'কে উঠতে দেয়া হ'তো না, পাশের ঘরেই পাহারা দিচ্ছেন ছাত্রের অভিভাবক: উঃ, সে কী হৃদয়-বিদারক শ্বাসকষ্ট, প্রতিমুহূর্ত্তে সে কী পঙ্কিল নরকযন্ত্রণা! তবু, এতো করে', মিলতো কি না কুড়িটি করে' টাকা। তা-ও কিনা হায়, রইলো না।

চিঠিটা পড়া শেষ করে'ও দর্শনের মুখে যেন আনন্দের আভা এলো না; নিষ্প্রভ গলায় বল্‌লে,—কিন্তু বাড়ি থেকে মত দিলে হয়।

—মত দেবে না কী? দর্শনের হাত থেকে চিঠিটা কেড়ে নিয়ে ইন্দ্রাণী চোখে-মুখে, শরীরের প্রতিটি রেখায় ঝিলিক দিয়ে উঠলো: পায়ের ঘাম মাথায় ফেলে উদরান্ন সংস্থান করবো, এর চেয়ে মহত্তরো কাজ মানুষের আর কী থাকতে পারে? মত দেবে না, এদিকে আমাদের ট্যাক্‌সো দিতে হ'বে না মাস-মাস?

দর্শন উত্তরের জান্‌লার কাছে দাঁড়িয়ে বাইরের রাস্তার দিকে চেয়ে বল্‌লে,—কিন্তু দায়িত্ব তো আমার, ইন্দ্রা।

—ককৃখনো না, দু'জনের। ইন্দ্রাণী দীপ্তকণ্ঠে বল্‌লে,—বিশ্লেষণ করে' দেখতে গেলে—একলা আমার। তুমি যতোদিন বিয়ে করো নি, একেবারে হাল্‌কা, স্বাধীন ছিলে, সংসার তোমাকে ধরতে-ছুঁতে পেতো না। আমাকে বিয়ে করে'ই তোমার পাখা

গিয়েছে কাটা, তোমার পায়ে পড়েছে বেড়ি। বিয়ে করার সঙ্গে-সঙ্গেই তুমি সংসারের কয়েদে হয়েছো বন্দী, বলতে গেলে; আমিই তোমাকে এই বন্ধনের মধ্যে নিয়ে এসেছি—তোমার সর্ব্বক্ষণ এই সংসারের কাছে অপরাধবোধের আমিই তো একমাত্র কারণ। তোমার সেই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত আমাকেই করতে হ'বে। ইন্দ্রাণী দর্শনের কাছে ঘেঁসে এলো: কেন, বাড়িতে অমত করবে কেন?

দর্শন ধরা গলায় বল্‌লে,—বাড়ির বৌ হ'য়ে শেষকালে চাকরি করবে, এটা কেউ পছন্দ করবে না।

—শেষকালে মানে, আগে আমি করিনি? কথার বিদ্যুচ্ছটায় ইন্দ্রাণীর সুপ্ত ব্যক্তিত্ব উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো: বৌ হয়েছি বলে' আমাকে একটা কাচের ঘেরাটোপের মাঝে লণ্ঠনের মতো মিটমিট করে' জ্বলতে হ'বে? তেল আসবে ফুরিয়ে, আর আস্তে-আস্তে আমি ক্ষয় হ'য়ে যাবো? দর্শনের হাতের উপর ইন্দ্রাণী তা'র উৎসাহ-উষ্ণ ডান হাতখানি রাখলো: তুমিই বলো, আমি কি এরই জন্য জন্মগ্রহণ করেছি? এমনি পড়ে'-পড়ে' ঘুমোনো, আর বসে'-বসে' হাই তোলা? আমি কি আমাকে খাটাবো না, ব্যবহার করবো না? কা'র কী মতের জন্যে আমাদের মাথা-ব্যথা পড়েছে, আমরা যখন ভালোবাসলাম, বিয়ে করলাম, তখন কা'র মতের অপেক্ষা করেছিলাম শুনি?

—কিন্তু, হাতের মুঠোর মধ্যে ইন্দ্রাণীর হাতখানা নাড়াচাড়া করতে-করতে দর্শন বল্‌লে,—কিন্তু আমারই তোমাকে খাওয়াবার কথা।

—কক্‌খনো না। ইন্দ্রাণী হঠাৎ লঘুকণ্ঠে হাসির কলরোল তুল্‌লে : আমিই বরং তোমাকে খাওয়াবো, এই আমাদের **holy contract** ছিলো। তুমি যখন পাচ্ছ না, তখন আমাকেও হাত গুটিয়ে বসে' থাকতে হ'বে, দু'জন দু'জনকে অধোগতির দিকে টেনে নিয়ে যাবো—আমরা এর জন্যে বিয়ে করিনি। আমরা পরস্পরের **supplement** হ'বো, এরি জন্যে তো আমি আর তুমি।

'তুমি যখন পাচ্ছ না', কথাটা দর্শনের মর্ম্মান্তমূল পর্য্যন্ত বিদ্ধ করলো। দর্শন বল্‌লে,—আমার জন্যে তোমাকে এই কষ্ট, এই লাঞ্ছনা সইতে হ'বে—

—বলিহারি তোমার ভাষাজ্ঞান! ইন্দ্রাণী দুই বিসর্পিত বাহু দিয়ে দর্শনের গলা জড়িয়ে ধরলো; কানের কাছে মুখ এনে চুমু খাবার মতো করে' বল্‌লে,—সত্যি, সত্যি তুমি আমার অযোগ্য—তুমি আমাকে আর তোমাকে আলাদা করে' দেখছ, তোমাকে যে আমি ভালোবাসি তা'র একটা বাহ্যিক প্রমাণ পর্য্যন্ত তুমি চাও না।

—কিন্তু আরো ক'টা দিন অপেক্ষা করলে পারো, সেই ইন্‌সিয়োর কোম্পানির থেকে ফাইন্যাল কথা এখনো পাইনি। তোমার সুপারিশে হ'য়েও যেতে পারে মনে হচ্ছে।

—ভালোই তো। ইন্দ্রাণী সরে' এসে বল্‌লে,—দু'জনে মিলে আয়ের সংখ্যাটাকে একটা ভদ্র চেহারা দেয়া যাবে। কিন্তু সে যখন হ'বার তখন হ'বে—মাসে পঞ্চাশ টাকা তাই বলে' আমি খামোকা হাতছাড়া করতে পারবো না। তুমি আমাকে আজই

নিয়ে চলো গড়পার। দেখলে তো চিঠি, যতো শিগ্‌গির সম্ভব, আমাকে জয়েন্ করতে বলেছে। আর দেরি নয়—আজই। আর, তেরো দিনের মধ্যে ইলেকট্রিক-বিল্ দিতে না পারলে রিবেট পাওয়া যাবে না, খেয়াল আছে তোমার? টাকা কই?

বেড়াবার নাম করে' দর্শনের সঙ্গে ইন্দ্রাণী বেরিয়ে গেলো চাকরি করতে। হেঁটেই—দূরের রাস্তা নয়। বুক ভরে' বাতাসের নিশ্বাস নিয়ে ইন্দ্রাণী বল্‌লে,—আর সবটাই টাকার কোশ্চেন নয়, যদিও আপাততো মাত্র জীবনধারণের জন্যেই ওটার এতো দরকার। তোমার অবস্থা যদি কোনোদিন স্বচ্ছল হয়, আমি তখনো কেবল নির্ভাবনায় আরাম করবো নাকি ভেবেছো? করবার কি আর আমার কোনো কাজ থাকবে না?

দর্শন বল্‌লে,—কিন্তু আমার কাছে তো তুমি আরামই চাও ইন্দ্রা, সব স্ত্রীই চায়।

ইন্দ্রাণী খিল্‌খিল্ করে' হেসে উঠলো; বল্‌লে,—কতো স্ত্রী তুমি দেখেছ। নিজের কাছে যাদের কিছু চাইবার নেই, তা'রাই চায় পরের কাছে আরাম, কিন্তু আমি? ইন্দ্রাণী হঠাৎ স্বর করে' আওড়াতে লাগলো: 'তোমার কাছে আরাম চেয়ে পেলেম শুধু লজ্জা, এবার সকল অঙ্গ ঘিরে পরাও রণসজ্জা।' দর্শনের একটা হাত মুঠোয় চেপে ধরে' সে ফের বল্‌লে,—আমিও তোমার পাশে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করতে চাই, আমি তোমার সহধর্ম্মিনী না?

দেখতে-দেখতে ইন্দ্রাণীর সমস্ত চেহারা যেন বদলে গেলো, আলোর চেতনায় রাত্রির নিঃসাড় আকাশ যেমন বদ্‌লায়। চেতনার ছটায় তা'র সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যেন ঝল্‌সে উঠেছে।

চোখে তেজ, ঠোঁটে সাহস, চিবুকে সঙ্কল্প—ইন্দ্রাণী এখন অনির্ব্বচনীয় সুন্দর। দুই পায়ে ক্ষিপ্রতার উল্লাস, পদপাতের তালে-তালে শরীর থেকে উছ্‌লে পড়ছে তা'র চিত্তের পরিপূর্ণতা। সেই একটা বন্য ব্যাঘ্রীর বিলাসবিক্রম : তা'র দেহ যেন নতুন ঝক্‌ঝকে একটা অটোমোবিল। সমুদ্রের বাতাস পেয়ে সে যেন তুলে দিয়েছে তা'র জাহাজের পাল, তা'র যাত্রা যেন পলায়মান দিগন্তের সন্ধানে। এই ইন্দ্রাণীই রচনা করবে তা'র জন্যে শয্যা, শিয়রে জ্বালবে প্রদীপ, জীবনকে করে' তুলবে অখণ্ড একটি স্বর্গের অবসর, সেই স্বপ্নের মাধুরী যেন কোথায় এক নিমেষে অন্তর্হিত হ'য়ে গেলো। তবু তা'র এই দৃপ্তি, এই মত্ততা, এই বলসাধনা—এতেও ইন্দ্রাণীকে কতো অতুলনীয় সুন্দর লাগছে।

বাড়ি পেয়ে ইন্দ্রাণী বল্‌লে,—আমি এখানে নির্ব্বিঘ্নে থাক্‌বো, ঘণ্টা দুই পরে তুমি আমাকে নিতে এসো, কেমন? একা-একা বাড়ি ফিরবো না, বুঝলে?

তা'কে সেখানে চাকরিতে বসিয়ে দর্শন টহল দিতে লম্বা রাস্তা নিলে। একবার ভাবলে রায়-এর সঙ্গে দেখা করে' আসে, আজ-কালের মধ্যেই তা'কে তিনি যেতে বলে' দিয়েছিলেন। কিন্তু কী হ'বে সেখানে গিয়ে? ইন্দ্রাণীর সঙ্গে তা'র মেয়েদের বন্ধুতা আছে বলে' যদি তিনি দয়া করে' তা'কে চাকরিটা দেন হাতে ধরে'—কেননা সে ইন্দ্রাণীর স্বামী, সেই ইন্দ্রাণীর, পরীক্ষায় যে বরাবর ফার্স্ট্ হ'য়ে এসেছে, যার কণ্ঠে খেলতো গানের বিদ্যুৎ, শরীরে ছন্দের তরঙ্গিমা—সেই ইন্দ্রাণী আজ একটা অপদার্থের

হাতে পড়ে' দুঃস্থ, বিপন্ন, তা'কে অর্থাৎ তা'র স্বামীকে যদি তিনি কিছু সাহায্য করেন। একনিশ্বাসে দর্শনের সমস্ত উৎসাহ নিবে গেলো। ইন্দ্রাণীর স্বাধীন স্বামিমনোনয়নের গর্ব্বকে লাঞ্ছিত করতে তা'র ইচ্ছা হ'লো না, প্রতিপন্ন করতে তা'র নিজের লজ্জাকর অপৌরুষকে। অন্যমনস্কের মতো সে এখানে-সেখানে হাঁটতে লাগলো। পুরুষ হ'য়ে সে তা'র প্রেমাস্পদকে আয়ত্ত করতে পারলো, কিন্তু সেই প্রেমকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে পাচ্ছে না সে একটি সহজ-সমতল, সুসমঞ্জস জীবন, পাচ্ছে না সে একটা হেয়, মূর্খ, অকিঞ্চিৎকর চাকরি।

দশ

কথাটা চাপা রইলো না, কর্ণপরম্পরায় বড়-দা শুনতে পেলেন। ইন্দ্রাণী রয়েছে বারান্দায়, মা আছেন ঘরে, এমনি একটা দৃশ্যসংস্থান বেছে নিয়ে, দু'জনকে শুনিয়েই তিনি বলে' উঠলেন: এ কী শুনতে পাই, মা?

ঘরের ভিতর থেকে উদ্বিগ্নকণ্ঠে সৌদামিনী বললেন,—কী?

—এই যে শুনছি ছোট-বৌ নাকি মাষ্টারি করতে যায়? এ কী অনাসৃষ্টি কাণ্ড!

—অনাসৃষ্টি কোন্‌টা নয়? নাড়া পেয়ে ছাইচাপা আগুন যেন শিখা বিস্তার করলো: বিয়েটাই তো একটা কেলেঙ্কারি, নিতান্ত কল্‌কাতা সহর বলে' টিঁকে আছি। দেশে-গাঁয়ে হ'লে আর রক্ষে থাকতো না।

—কিন্তু এ কী ভীষণ কথা! বৌ যাবে চাকরি করতে! তুমি বারণ করতে পারো না?

—বাবা, আমি যাবো বারণ করতে? বৌ তো নয়, আস্ত একগাছ বাঁশ, কে তা'কে মচ্‌কাতে যাবে শুনি? ধনুকের মতো বেঁকেই আছে সব সময়, সামনে ৃিয়ে দাঁড়ালেই

চোখা-চোখা বাণ ছুঁড়তে সুরু করবে। কে এগোয় তা'র কাছে ?

—তাই বলে' মান-সম্মান খুইয়ে যা-খুসি সে করবে নাকি ? বাড়ির বৌ না সে ? এ কী অন্যায় কথা !

সৌদামিনী ঠোঁট মুচ্‌ড়ে বল্‌লেন,—আরো কতো কী কাণ্ড করে ছাখ্।

—না, এখানে এ-সব চলবে না বলে' দিচ্ছি। বড়-দা বারান্দাকে সম্বোধন করলেন : এটা ভদ্রলোকের বাড়ি, বৌ হ'য়ে চাকরি-ফাকরি করার এখানে রেওয়াজ নেই।

সৌদামিনী মুখটা রেখায় কুঞ্চিত করে' বললেন,—হ্যাঁ, তোর কথা সে শুনতে গেছে।

—শুনবে না কী ? আমার এ বাড়ি—আমি এ পছন্দ করি না। বড়-দা গর্জ্জন করে' উঠলেন : এ-সব বে-আদবি করতে হয়, আমার বাড়ির বাইরে গিয়ে। বাড়িতে বসে' এই অনাচার আমি ককৃখনো সইবো না। দর্শন—দর্শন গেলো কোথায় ? তা'কে তুমি বলে' দিয়ো মা, বৌকে খাটিয়ে টাকা-রোজগারের বাড়ি এটা নয়। ছি, ছি, মানুষে বলে কী! পাড়ায় মুখ দেখানো আমার ভার হ'য়ে উঠলো যে! তুমি বলে' দিয়ো দর্শনকে।

—কেন, তুই বলতে পারিস না ?

—না, না, তুমি বলে' দিয়ো ওকে স্পষ্ট করে', বৌ নিয়ে নির্লজ্জ মাতামাতি করতে হয়, এ-বাড়ির বাইরে তা'র অনেক জায়গা আছে। বলে' তিনি বারান্দায় ইন্দ্রাণীর দিকে একটা সূচ্যগ্রতীক্ষ্ণ

বিষাক্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে' সিঁড়ি দিয়ে গজ্-গজ্ করতে-করতে নেমে গেলেন।

দর্শনকে কিছুই বলতে হ'লো না অবিশ্যি। যাকে বলবার, তা'কে তিনিই যথেষ্ট বলে' গেছেন। নিজেকে ইন্দ্রাণীর ভারি অসহায় ও অবসন্ন লাগতে লাগলো: না পারলো এই সব কটূক্তির সে প্রতিবাদ করতে, না পারলো নিজের আচরণে প্রকাশ করতে তা'র সত্যোপলব্ধির দৃঢ়তা। এই পরিবারের পরিধির মধ্যে আন্‌তে হ'লো আবার তা'র ব্যক্তিত্ববোধকে বিশীর্ণ, সঙ্কুচিত করে'। ছেড়ে দিতে হ'লো তা'র চাকরি: ফুরিয়ে গেলো তা'র গান।

মেজ-দা ব্যাপারটাকে অন্য আলোয় দেখলেন। দর্শনকে বল্‌লেন,—তোর লজ্জা করে না দর্শন, শেষকালে তোর বৌর রোজগারের পয়সা খেতে হচ্ছে ?

দর্শন পীড়িত মুখে বল্‌লে,—কী করা যাবে বলো, তন্ন-তন্ন করে' খুঁজেও যখন একটা জুৎসই চাকরি পাচ্ছি না—

—তাই বলে' বৌকে দিয়ে চাকরি করাতে হ'বে ? তুই একটা পুরুষ না ?

বেদনার্ত্ত হাসিতে দর্শনের মুখাভাস ভারি করুণ দেখালো: আজকালকার চাকরির বাজারে সেই তো আমার প্রকাণ্ড disqualification। মেয়েরা বরং একটু লেখাপড়া শিখলে কতো সহজে চাকরি পাচ্ছে।

—তাই বৌকে চাকরি করতে পাঠিয়ে নিজে বসেছিস চুল বাঁধ্‌তে। বাহাদুর বটে! একেই বলে পুরুষসিংহ। বিরক্তিতে

মেজ-দার মুখ কুটিল হ'য়ে উঠলো: কেন, রাস্তায় একটা মুটেগিরি, ষ্টেশনের একটা কুলিগিরি তোর মেলে না? এই জোয়ান শরীর, পারিস না রিক্‌সা টান্‌তে?

দর্শন হেসে বল্‌লে,—এ সব-ও মেজ-দা, লক্ষপতি হ'বার মতোই দুর্লভ স্বপ্ন। যা অসম্ভব, তা'কে নিয়ে কবিত্ব করে' লাভ কী।

—আর সম্ভবের মধ্যে তুই দেখছিস কেবল এই বৌয়ের আঁচল হাট্‌কানো—কী সে ক্ষুদকুঁড়া জোগাড় করে' আনলো। রাস্তায় যে ঝাড়ু দেয়, যে ময়লা-গাড়ি হাঁকায়, তা'র পর্য্যন্ত তোর চেয়ে বেশি সম্মান, বেশি প্রতিষ্ঠা। ছি, ছি, তা'র চেয়ে বৌয়ের আঁচলের ফাঁসটা গলায় জড়িয়ে ঝুলে পড়লেই হয়।

অতএব, ইন্দ্রাণীকে, আগেই বলেছি, চাকরিতে ইস্তফা দিতে হ'লো, তা'র স্বামীর এই কৃত্রিম মর্য্যাদা রক্ষার জন্যে। এই বাধার সঙ্গে সমানুপাতে দর্শন তা'র ব্যক্তিত্বকে বিস্ফারিত করতে পারলো না, পরিবারের কাছে সে পরাজয় স্বীকার করলে। যে-টাকার জোরে সে করতে পারতো বিদ্রোহ, সে-টাকার জন্যেই তা'র যেন পিপাসা গেছে ফুরিয়ে। আজ চারদিকে কেবল অভাবের তাণ্ডব, দারিদ্র্যের নিপীড়ন। ইন্দ্রাণীকে সঙ্গে করে' ধীরে-ধীরে ক্ষয় হ'য়ে যাওয়ার মধ্যেই যেন তা'র স্বামীত্বের সার্থকতা।

প্রথম প্রেমের উত্তাপে ইন্দ্রাণীকে সে এখান থেকে নিয়ে যেতে চেয়েছিলো—পরিবারের এই বিমর্ষ আবহাওয়া থেকে: সে শুধু তা'র গৃহিণী নয়, পথের সহচরী। কিন্তু এখন নিশ্চিত আশ্রয়ের মোহে তা'র সমস্ত বহিরাকাঙ্ক্ষা স্তিমিত হ'য়ে এসেছে। দারিদ্র্যের

তাড়না ততো দুর্ব্বিষহ নয়, যতো তা'র সঙ্গে দর্শনের এই নির্লজ্জ সামঞ্জস্য রাখবার চেষ্টা। কষ্ট সহ্য করবার মহিমারো একটা সীমা আছে: সে-রেখা উত্তীর্ণ হ'য়ে যেতেই সে-ক্লেশ তখন ইন্দ্রাণীর কাছে শারীরিক অসতীত্বের মতোই গ্লানিকর মনে হচ্ছিলো। মাত্র দেহটাকে অবশিষ্ট রেখে প্রেম যেন নিব্‌তে বসেছে, আত্মা করেছে আত্মহত্যা। এই আত্মহত্যার অমর্য্যাদা থেকে স্বামীকে যদি সে না বাঁচাতে পারে, তবে জীবনে তা'র অহঙ্কার করবার আর থাকবে কী?

তা'দের দু'য়ের মাঝে নেমেছে যেন অপরিচয়ের যবনিকা: পরস্পরকে দু'জন ক্ষণে-ক্ষণে চলছে এড়িয়ে। বিস্তৃত হ'য়ে উঠছে ব্যবধান, এদিকে ফেনিয়ে উঠছে সংসারের হলাহল। দর্শন বোঝে ইন্দ্রাণীর অসীম বৈফল্য, ইন্দ্রাণী বোঝে দর্শনের এ নিষ্ক্রিয় বিমুখতা। দর্শন বোঝে ইন্দ্রাণীর এই ঘরের মধ্যে নির্ব্বাসনের অনভ্যাস, ইন্দ্রাণী বোঝে দর্শনের এই বাইরের প্রতি সাতঙ্ক সঙ্কোচ। এই ক্লেশকর জীবনযাপনের সঙ্গে ইন্দ্রাণী যে মোটেই পরিচিত হ'তে আসেনি, সে যে রাখতে পারছে না দর্শনের এই সীমাবদ্ধতার সঙ্গে সহজ সঙ্গতি, তা'র বেদনা দর্শনের চোখে-মুখে, কাজে-কথায়: আর দর্শন যে পরাঙ্মুখ ইন্দ্রাণীর প্রেমের বলিষ্ঠ সাহচর্য্য নিতে, জীবনের নতুন অর্থাবিষ্কারের সন্ধানে বেরিয়ে আসতে বাইরের বিস্তীর্ণ আকাশের নিচে, ইন্দ্রাণীর নিস্তব্ধ মন্থরতায় পুঞ্জিত হ'য়ে উঠেছে সেই অভিমান।

এইভাবে বেশি দিন গেলো না। একদিন দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর দর্শন ঘুমোবার চেষ্টা করছে, ইন্দ্রাণী কোথা থেকে

তা'র বুকের উপর এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো, আনন্দে বিহ্বল গলায় সে বল্‌লে,—তোমার জন্যে ভারি একটা শুভ সংবাদ আছে, আমাকে কী খাওয়াবে বলো।

এ ক'দিনের মলিন ম্রিয়মাণতার পর ইন্দ্রাণীর শরীরে এই খুসির ছল্‌ছলানি দেখে দর্শন অবাক হ'য়ে গেলো। এ ক'দিন সে তা'র কাছে ধরা দেয় নি, দুপুরে যখন সে ঘুমোয়, তা'কে দেখতে নাকি এতো কুৎসিত হয় যে তা'কে ছুঁতেও তা'র ঘেন্না করে। হঠাৎ এই বিচ্ছেদের সমুদ্র পেরিয়ে ইন্দ্রাণী স্পর্শে ফেনিল হ'য়ে তা'র শরীরের তটে এসে আঘাত করলে, এটাই যেন তা'র কাছে যথেষ্ট শুভ সংবাদ।

দর্শন শোয়া ছেড়ে উঠবার চেষ্টা করতে-করতে বল্‌লে,—কী? আমার একটা চাকরির দরখাস্তের জবাব এলো বুঝি? দেখি, দেখি—কোন্‌টা? লাহোরের সেটা হ'লে কিন্তু **great**—বাঙলা-দেশ থেকে একবার বেরোতে পারলেই বাঁচি বাবা। দাও।

খবরটা ভাঙতে যেন ইন্দ্রাণী আর গলায় জোর পাচ্ছে না। তা'র এখনকার মুখের চেহারা দেখলে মনে হয়, না-জানি কতো বড়ো একটা দুঃসংবাদ সে নিয়ে এসেছে। বাহুর বেষ্টনী শিথিল করে' ম্লান গলায় সে বল্‌লে,—তোমার নয়, এসেছে আমার চাকরির খবর।

—তোমার?

—আর এইখেনে নয়, তোমার ভাবতে হ'বে না। ইন্দ্রাণী তক্তপোষের একধারে সরে' বস্‌লো; বুকের সেমিজের তলা থেকে চওড়া একটা খাম বা'র করে' দর্শনের হাতে সেটা পৌঁছে

দিতে-দিতে বল্‌লে,—দিনাজপুরে। য়্যাসিষ্ট্যাণ্ট হেড্‌-মিস্‌ট্রেস্‌। একশো টাকা মাইনে। আর এই আস্‌ছে মাস থেকেই। দেয়ালের ক্যালেণ্ডারের দিকে ইন্দ্রাণী ফ্যালফ্যাল করে' চেয়ে রইলো: মাসের আজ কতুই? একত্রিশ দিনে মাস—আর পুরো এক সপ্তাহও নেই।

বালিশে ফের হেলান দিয়ে পা দুটোকে টান করতে-করতে দর্শন বল্‌লে,—চাকরিটা তুমি নেবে নাকি?

—বা, নেবো না? তুমি এ কী idiotic প্রশ্ন করলে একটা? চাকরি নেবো না মানে? ইন্দ্রাণী উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠলো: একশো-বার নেবো, এক্ষুনি নেবো। নইলে এইখানে বসে' পচে' মরবো নাকি? পরের প্রত্যাশী হ'য়ে কাঙালপনা করবো নাকি চিরকাল?

দর্শন নিস্পৃহ, নিরাসক্তের মতো বল্‌লে,—কবে যাবে?

খুসির ছটায় তারকাঞ্চিত রাত্রির মতো ইন্দ্রাণীর দেহ থর্‌থর্‌ করে' কেঁপে উঠলো: যদি বলো তো, আজই, আজকের নর্থ-বেঙ্গলে। এখান থেকে বেরিয়ে পড়বার জন্যে খাঁচার দেয়ালে সেই কবে থেকে পাখা ঝাপ্‌টাচ্ছি, আজ দরজা পেয়েছি খোলা। চলো, আজই বেরিয়ে পড়ি। টাকা? চলো, বিকেলে একটু চেষ্টা করলেই শ' খানেক টাকা raise কর্‌তে পারবো।

দর্শনের এতোটুকুও উৎসাহ দেখা গেলো না। বল্‌লে,— সেখানে কোথায় থাকবে?

—বা, আমি ফ্রি কোয়ার্টার পাবো না? আমি যে যুগল, হেড্‌মিস্‌ট্রেস্‌ তা জানেন। Self-contained আলাদা বাড়ি

আমার জন্যে তৈরি, মালতী-দিও 'সপত্তিক' সেখানে থেকে গেছেন। থাকা-খাওয়ার দিক থেকে নাকি একেবারে perfect।

দর্শন বল্‌লে—তা হ'লে তো ভালোই।

ইন্দ্রাণী বালিশের উপর মাথাটা তা'র নেড়ে দিয়ে বল্‌লে,—তুমি এতো cold কেন বলো তো? তোমার কী হ'লো?

মুখে হাসি আনবার চেষ্টা করে' দর্শন বল্‌লে—না, কী হ'বে?

—তবে এমন একটা সুখবর পেয়ে তুমি একটুও সাড়া দিচ্ছ না যে?

—তোমার চাকরি-পাওয়াটা আমার পক্ষে সত্যিই সুখবর কি না তাই ভাবছিলাম। দর্শন হাত বাড়িয়ে ইন্দ্রাণীকে ফের কাছে টেনে আনলো, চশমার রিম্ ঘেঁসে তা'র ডান ভুরুর উপর ধীরে-ধীরে আঙুল বুলোতে-বুলোতে ভারি গলায় বল্‌লে,—তুমি কতো সহজে একেকটা কাজ পেয়ে যাও ইন্দ্রাণী, আর আমি সমানে দু'বচ্ছর যা-তা একটা চাকরির জন্যে ফ্যা-ফ্যা করছি। তোমার ওপর আমার ঈর্ষা হচ্ছে।

—ঈর্ষা হচ্ছে, আমি কি তোমার পর? ইন্দ্রাণী দর্শনের পাশে ঘন হ'য়ে বসলো: আমার ওপর তো তোমার আগাগোড়া লোভ হওয়া উচিত। আমিতো তুমিই। আমার দেহ, মন, প্রাণ—সব যদি তোমার হ'তে পারলো, সামান্য ক'টা টাকা তোমার হ'তে পারবে না?

ই ন্দ্রা ণী

তা'র ঘন, এলোমেলো চুলের উপর সস্নেহে হাত বুলোতে-বুলোতে দর্শন বল্‌লে,—তোমার একটা চাকরি না নিলে কিচ্ছুতেই আর চলে না, না ইন্দ্রাণী ?

—বলো, আর কী **alternative** আছে ? কী আমি করতে পারি এ ছাড়া ?

দর্শন একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বল্‌লে,—না, কিছুই তো আর নেই।

—আমি তো আর সখ করে' চাকরি করতে যাচ্ছি না, ইন্দ্রাণী বল্‌লে,—নিতান্ত পেটের দায়ে। যদি বলতে দাও, বলি, কেবল তোমার জন্যে। তোমার এতে কিছুই অসম্মান নেই, বরং আমি যে তোমার সত্যিকারের স্ত্রী, সেইটাই আমার পক্ষে সাঙ্ঘাতিক গৌরব। ডান হাত যদি অক্ষম হয় আর সেই সঙ্গে বাঁ হাতও যদি দেখাদেখি ধর্ম্মঘট করে' বসে, তবে শরীর টেঁকে কী করে' ? নিজেকে বাঁচাবার মতো মহৎ কাজ মানুষের আর কী থাকতে পারে বলো ?

—কিন্তু আমি কতো ছোট, ইন্দ্রাণী।

ইন্দ্রাণী এক ঝট্‌কায় উঠে পড়লো ; বল্‌লে—তাই বলে' বুঝি আমাকেও ছোট করে' রাখতে চাও—আর তা'তেই বুঝি তোমার মর্য্যাদা বেড়ে যাবে ? ওঠো, তোমার সঙ্গে বাজে বকতে পারি না আর, যাবার ব্যবস্থা সব এখন থেকেই করে' ফেল্‌তে হয়। নিজেই তো বাপু তখন বলতে, এই সাংসারিক তুচ্ছতার জন্যে আমি জন্মগ্রহণ করি নি, আমার উদ্দেশ্য আরো মহত্তরো—এখন নিজেই মিইয়ে গেলে চলবে কেন ? ইন্দ্রাণী এটা-ওটা

টুকিটাকি কাজ সারতে লাগলো : দেখ দেখি, নিজের চেহারাখানা কী করেছ ! দারিদ্র্য যতো বাড়ছে, ততো যেন বাড়ছে তোমার তৃপ্তি। বাবাঃ, দুধের দাম দিতে পারি না বলে' বাড়িতে চা খেতে পাবো না, এমন অত্যাচারের কথা কে কবে শুনেছে ? তুমি মুখের কথায়ই যতো কামান দাগো ; আর সত্যি যখন তোমার কথা শুনে কাজ করতে যাই, তখনই তোমার উৎসাহের বারুদ যায় ফুরিয়ে। চাকরি করবে না, পরের ঘুঁটে কুড়োবে ? তুমি যখন পারছ না, আমাকেও তখন পারতে হ'বে না—কী চমৎকার বুদ্ধি তোমার ! তবে আমি—আমি কেন ? তবে এতো মেয়ে থাকতে তুমি ইন্দ্রাণীকে ভালবেসেছিলে কী দেখে ? তুমি যখন পারবে না, তখন আমাকেই হাজার বার চাকরি করতে হ'বে। ইন্দ্রাণী আবার দর্শনের কাছে ফিরে এলো : নাও, ওঠো, আজই যাবো। কী তোমার নেবার, গোছগাছ করে' নাও। আমি যে মাষ্টারি করতে গিয়ে কী পরে' বেরুবো মেয়েদের কাছে,—সে যাক্ গে। চলো, কিছু আপাততো ধার জোগাড় করি গে।

দর্শন বল্‌লে,—আমি কোথায় যাবো ?

—বা, তুমি আমার সঙ্গে যাবে না দিনাজপুর ?

—তুমি চাকরি করতে যাবে, আমি সেখানে গিয়ে করবো কী ?

নিমেষে ইন্দ্রাণীর মুখ কঠিন, গম্ভীর হ'য়ে উঠলো। বল্‌লে,— আর, তুমি একটা চাকরি পেয়ে গেলে আমাকেই বা এখানে তবে থাকতে হ'বে কেন ? আমারই বা তখন কী কাজ ! আমার এই প্রয়োজনসাধনের মহান প্রচেষ্টাকে তুমিও কিনা অগৌরবের

জিনিস বলে' ভাবতে শিখেছ, আর এই যে প্রত্যহ আমাকে অশুদ্ধি দারিদ্র্যের মধ্যে টেনে নিয়ে আসছ, এতেই তোমার সম্মান বাড়ছে ? তোমার সম্মান বাড়ছে উঠতে-বসতে রোজ এই সংসারের নিন্দা-বিদ্রূপের খোঁচা খেয়ে ? নানাদিকে তোমার অর্থ ব্যয় করতে আমার সম্মান যায় না, সম্মান যায় তোমার জন্যে অর্থ উপার্জ্জন করলে ? তোমাকে বিপন্ন করলে আমার সম্মান কমে না, কমে, তোমাকে বিপদের দিনে সাহায্য করতে গেলে ? রান্না করতে পারবো, ঘর ঝাঁট দিতে পারবো, নর্দ্দমা পরিষ্কার করতে পারবো, একটা য়্যাসিট্র্যাণ্ট হেডমিস্‌ট্রেসের চাকরি করতে পারবো না ?

কথায় উজ্জ্বল, গতিশীল, ইন্দ্রাণীর আরক্ত মুখের দিকে চেয়ে দর্শন বল্‌লে,—আমি তা বলছিলাম না। চাকরি না করে' তোমার উপায় কী !

—নেইই তো উপায়। প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গের স্বরে ইন্দ্রাণী ঝাঁজিয়ে উঠলো : তবে তোমার এখানে উপোস করে' শুকিয়ে মরবো নাকি ভেবেছ ? না, সেইটেই আমার খুব একটা সম্মানের কাজ হ'বে ?

—তা-ও নয়, দর্শন শোয়া ছেড়ে উঠে বসলো : কিন্তু আমার সেখানে কী কাজ আছে বলো ? আমি করবো কী ?

ইন্দ্রাণীর মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো : এখানে যা করতে, তাই। তোমার কী, খাবে-দাবে, ঘুমুবে আর দিস্তে-দিস্তে দস্তখৎ পাঠাবে। আবার কী কাজ !

কথা কয়টা বিষাক্ত সাপের ছোবলের মতো দর্শনের মুখের রক্ত শুষে' নিলো। অবশ, নিষ্প্রাণ গলায় সে বল্‌লে,—তা'র চেয়ে

আমার মরে' যাওয়াই বড়ো কাজ, ইন্দ্রাণী। তখন তুমি একেবারে মুক্ত, একবারে একলার।

কথাটা বলে' ফেলেই ইন্দ্রাণী ভয় পেয়েছিলো, হঠাৎ দর্শনের কথা শুনে সে সেই ভয়ের মেঘের উপর ছড়িয়ে দিলো হাসির বিদ্যুদ্বন্যা। ইন্দ্রাণী জোরে, গলা ছেড়ে, ঘরের সমস্ত শূন্য কাঁপিয়ে খিল্‌খিল্ করে' হেসে উঠলো। দুই সুপুষ্ট, সবল হাতে দর্শনের গলা জড়িয়ে ধরে' হাস্‌তে-হাস্‌তে বল্‌লে,—উঃ, তুমি কী morbid! এতো বড়ো সুখের সময় কিনা মরণের কথা মুখে আনো। নিজের দুই প্রসন্ন, আয়ত চোখের উপর স্বামীর নিরাভ, বিষণ্ণ মুখ স্পষ্ট করে' তুলে ধরে' সে বল্‌লে,—বটে! আমি আমার একলার জন্যেই তো এই কষ্ট করছি, তুমি আমার কেউ নও, আমার মাথার সিঁদুরের কোনো মানে নেই? আমি তোমাকে ছেড়ে থাকতে চাই না, আর তুমি আমাকে ছেড়ে চলে' যেতে চাও? পুরুষের এ-ভালোবাসার আবার বড়াই করো তোমরা? পরে তা'র দুর্ব্বল, নির্বাধ, অসহায় মুখ ইন্দ্রাণী তা'র বুকের উপর চেপে ধরলো: তোমাকে ছাড়া আমি থাকবো কি করে'? নতুন জায়গা, নতুন চাকরি, সেখানে তুমিও আমার নতুন। দু'জনে একা-একা কেমন আরামে থাকবো বলো দেখি? আলিঙ্গন হঠাৎ শিথিল করে' অভিমানে সজল দুই চক্ষু তুলে ইন্দ্রাণী ফের বল্‌লে,—আমাকে ছেড়ে তুমি একলা থাকতে চাও?

অসহায় শিশুর মতো ইন্দ্রাণীর উত্তপ্ত আঁচলের মধ্যে মুখ লুকিয়ে দর্শন বল্‌লে,—পাগল!

এগারো

যেতে-যেতে আরো দু'দিন দেরি হ'য়ে গেলো।

রাত্রে ট্রেন, দর্শন একটা ঘোড়ার গাড়ি নিয়ে এসেছে, মাল-পত্রের মধ্যে দু'জনের দু'টো ট্রাঙ্ক আর স্যুটকেইস, আর দু'জনের একত্রিত একটা বিছানা। খবরটা এ দু'দিন দর্শন চাপা দিয়ে ছিলো, কিন্তু চাকরের হাত দিয়ে মালগুলি নিচে পাঠাতেই সৌদামিনী বিস্মিত হ'য়ে প্রশ্ন করলেন: এ কী, তুই চল্‌লি কোথায় রাত করে'?

সৌদামিনীর বিস্ময় আরো বেড়ে গেলো যখন দেখলেন দর্শনের পিছনে সসজ্জা ইন্দ্রাণী গায়ে একটা পাৎলা চাদর জড়িয়ে ছোট একটা য্যাটেসে-কেইস নিয়ে এগিয়ে আসছে।

—এ কী, তুমিও চল্‌লে কোথায়?

ইন্দ্রাণীকে আড়াল করে' দাঁড়িয়ে দর্শন বল্‌লে,—দু'জনে ক'টা দিন একটু ঘুরে আসতে যাচ্ছি, মা।

—ঘুরে আস্‌তে যাচ্ছ মানে? নীরদা কাছেই কোথায় ছিলো, কল্‌কলিয়ে বলে' উঠলো: তোমার বৌ যাচ্ছে চাকরি করতে, আর তুমি যাচ্ছ আঁচল ধরতে—সত্য কথাটা সোজাসুজি বল্‌তে

এতো লজ্জা কিসের? সংসারে চিনেছো তো কেবল ঐ পদপল্লব—বলো না, যাচ্ছ তারি পাদোদক খেতে?

দর্শন ইন্দ্রাণীকে লক্ষ্য করে' জোর-গলায় বল্‌লে,—দাঁড়িয়ে আছ কী ওখানে? চলে' এসো।

ইন্দ্রাণী সৌদামিনীর পায়ের কাছে উপুড় হ'য়ে প্রণাম করলো, একটিও কথা বললো না।

সৌদামিনী তা'র মুখের উপর রুখে এলেন: কলির বৌ ঘরভাঙানি হয় শুনেছি, কিন্তু তোমার মতো এমন বেআক্কেল মেয়ে তো কই দেখিনি বাপু। সংসারে টাকাই যদি রোজগার করতে চাও, করো গে, যেদিকে খুসি বেরিয়ে যাও না তুমি—কে তোমার পথ আটকাবে, কিন্তু দর্শনকে তুমি কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?

অন্ধকার সিঁড়ির উপর দর্শনের দিকে চেয়ে নীরবে ইন্দ্রাণী একটু হাস্‌লো। ধাপ চিনে-চিনে নেমে আসতে-আসতে সে একটি নিশ্বাসের পর্য্যন্ত শব্দ করলো না।

—ও যাবে কেন নিয়ে, আপনার দর্শনই যাচ্ছেন ল্যা-ল্যা করতে-করতে। নীরদার জিভ লক্‌লক্ করে' উঠলো: বৌ না হ'লে ওঁকে খাওয়াবে কে? এখন যে বৌই ওঁর মাথার মণি, অঞ্চলের সোনা। আর ওঁর কেউ নেই—দাদারা খেটে-খেটে হাড়-মাস ভাজা-ভাজা হচ্ছেন, আর উনি যাচ্ছেন কোল-সোহাগীকে নিয়ে হাওয়া খেতে। চণ্ডীচরণ ঘুঁটে কুড়ায়, রামা চড়ে ঘোড়া। পোড়ার দশা আর কি।

দর্শন নিচে থেকে অবতীর্য্যমান ইন্দ্রাণীকে উদ্দেশ করে' ফের বলে' উঠলো: শিগ্‌গির চলে' এসো।

সৌদামিনী কেঁদে-কেটে প্রায় একটা হাট বসাবার জোগাড়। নিভা ঢলোঢলো হ'য়ে বল্‌লে,—এমন বৌ-ন্যাওটা পুরুষমানুষ আর কোনোকালে দেখিনি, দিদি। হাঁচ্‌লে জীবো বলে, হাই তুললে তুড়ি দেয়। কামাখ্যার মেয়ে বাবা—হাড়েতে ভেল্কি হয়। নইলে ভাবো দিকি একবার, কোনো ঘরের বৌ টাকা রোজগার করতে রাস্তায় বেরিয়েছে,—মা গো, তা'র জন্যে আবার এতো আদেখ্‌লেপনা! অন্য কেউ হ'লে তেমন নটকীর থোঁতা মুখ ভোঁতা করে' দিতো না?

নীরদা সায় দিলো: দাব্‌ নেই—দাব্‌ না থাকলে স্ত্রী বশ মানবে কেন? হ'বেই তো সে গস্তানি, যাবেই তো সে উড়িয়ে-পুড়িয়ে, কুলে ছাই দিয়ে।

নিচে, সদর দরজার কাছে, দাদারা আবার পাকড়াও করলেন।

—এ কী, কোথায় চল্‌লি তোরা?

রোয়াকের উপর চলে' এসে পিছন দিকে না তাকিয়ে দর্শন গম্ভীর গলায় বল্‌লে,—দিনাজপুর।

—সেখানে কী?

—সেখানকার স্কুলে ইন্দ্রাণীর একটা কাজ হয়েছে।

মেজদা চিপ্‌টেন কাটলেন: আর তা'তে তোর কী কাজ হ'লো শুনতে পাই?

গাড়ির দরজাটা একহাতে খুলে দর্শন ব্যস্ততার ভাণ দেখিয়ে অনুসারিকা ইন্দ্রাণীকে বল্‌লে,—উঠে পড়ো।

বড়-দার গলা থেকে খাদগম্ভীরে আওয়াজ বেরুলো: শেষকালে বৌ নিয়ে আলাদা হ'য়ে যাচ্ছিস, দর্শন?

ইন্দ্রাণী

পা-দানিতে পা রেখে গাড়িতে উঠতে-উঠতে দর্শন বল্লে,—ভিড়ের মধ্যে একসঙ্গে থেকে বাঁচতে পারলাম কই? তারপর ইন্দ্রাণীর পাশে বসে' গাড়োয়ানকে হুকুম করলে: চলো।

গাড়ির চাকার ঘর্ঘরের সঙ্গে-সঙ্গে মেজ-দার কণ্ঠস্বর ভেসে এলো: বাঁচবার কী একখানা চমৎকার নমুনা।

খানিকক্ষণ কাটলো চুপচাপ। গাড়িটা মোড় ঘুরলো।

গায়ের থেকে চাদরটা ফেলে দিয়ে দুই হাতে দর্শনের দুই হাত তা'র কোলের উপর চেপে ধরে' ইন্দ্রাণী গভীর একটা নিশ্বাস ফেলে বল্লে,—বাঁচলাম। তুমি যে আমাকে শেষকালে বাইরে নিয়ে আসতে পারলে, উঃ, দুই হাতের মধ্যে ইন্দ্রাণীর হৃদয় থরথর করে' কাঁপতে লাগলো: একেই বলে অসহ্য সুখ।

তা'র সবল, উত্তপ্ত মুষ্টির সুদৃঢ় আশ্রয়ের মাঝে নিজের দুই হাত ছেড়ে দিয়ে দর্শন বিষণ্ণ গলায় বল্লে,—তুমিই তো আমাকে নিয়ে এলে, ইন্দ্রাণী, আমি কোথায়!

—তোমার মনে হচ্ছে না, সত্যি করে' বলো তো,—ইন্দ্রাণী সমস্ত দেহ-মনে যাত্রার এই অভিনব আনন্দ অনুভব করতে-করতে বল্লে,—আমরা খুব একটা বড়ো আদর্শের জন্যে বেরিয়ে এলাম। সে আমাদের বাঁচবার অধিকার, আমাদের স্বতন্ত্র, সম্পূর্ণ হ'বার মহান স্বার্থপরতা! আমার কী যে ভালো লাগছে তোমায় কী বলবো? সত্য কথা স্বীকার করতে আমাদের লজ্জা কি, জীবনে স্বার্থপর হ'বার মতো বড়ো আদর্শ কিছুই আর নেই পৃথিবীতে। কী বলো?

ই ন্দ্রা ণী

গ্যাসের আলোয় পাণ্ডুর, ধূসর রাস্তার দিকে চেয়ে দর্শন চুপ করে' বসে' আছে।

ইন্দ্রাণী খানিকটা অন্যমনস্কের মতো বল্‌লে,—আর সবাইর সঙ্গে তোমার টাকার সম্পর্ক, টাকায় পরিচয়। এমন যে গদ্গদ মাতৃস্নেহ, তারো গভীরতার মূলে রয়েছে টাকার অনুপাত। কেবল আমিই—হ্যাঁ, জোর করে'ই বলবো, ইন্দ্রাণী তা'র স্পর্শে আরো উত্তাপ, আরো আন্তরিকতা সঞ্চারিত করে' দিলো: কেবল আমিই টাকার দিকে চেয়ে তোমার কথা ভাবিনি, বরং তোমার দিকে চেয়ে টাকার কথা ভাবলাম। কেননা আজকের দিনে সকলের চেয়ে আমিই তোমার বড়ো সত্য। উত্তরে দর্শনের দিক থেকে একটা প্রগাঢ় সম্মতির জন্যে খানিকক্ষণ প্রতীক্ষা করে' ইন্দ্রাণী ফের আগের কথায় ফিরে গেলো: টাকার সম্পর্ক, কিছু-কিছু টাকা পাঠিয়ে তাঁদের সঙ্গে সেই সম্পর্ক বহাল রাখলেই হ'বে।

ইন্দ্রাণীর মুঠি থেকে আঙুলগুলি আলগোছে শিথিল করে' আনতে-আনতে দর্শন বল্‌লে,—তোমার টাকা তাঁরা নিতে যাবেন কেন? আমি পাঠালে হয়তো নিতেন, কিন্তু তুমি কে? আমি নিতে পারি বলে' সবাই তো আর—

আত্মধিক্কার দিতেও দর্শনের বিরক্তি এসে গেছে।

—না নিলে তো বয়ে' গেলো। অপস্রিয়মাণ আঙুলগুলো মুঠির মধ্যে আবার চেপে ধরে' ইন্দ্রাণী বল্‌লে,—তুমি নিলে—আমাকে তুমি সম্পূর্ণ করে' নিলেই আমি সার্থক। আমি আর কিছু চাই না।

ইন্দ্রাণী

তারপর, ট্রেন ছুটেছে উদ্দাম, রাত হ'য়ে এসেছে বিরহের মতো অবিচ্ছিন্ন। আকাশে ময়লা একটু জ্যোৎস্না উঠেছে। গাড়িতে যাত্রীরা সব স্তব্ধ, দর্শনও বালিশে মাথা এলিয়ে ঘুমে নিঝুম। ঘুমুচ্ছে বলে' তা'র মাথার সঙ্গে মাথা ঠেকিয়ে ইন্দ্রাণীও বেঞ্চির আধখানা জুড়ে শুয়ে পড়েছে বটে, কিন্তু তা'র ঘুম আসছে না। আরো কিছুক্ষণ চুপ করে' শুয়ে থেকে ইন্দ্রাণী উঠে বসলো। অবসন্ন জ্যোৎস্নায় ধূ-ধূ করছে মাঠ,—রাত্রিময় কী নীরন্ধ্র প্রশান্তি! যেন তা'র প্রেমের গভীরতার মতো অপরিমেয় সেই স্তব্ধতা। ইন্দ্রাণী দর্শনের মাথার নিচে একখানি হাত রেখে বালিশে তা'কে আরো ভালো করে' শুইয়ে দিলে। গলার বোতামটা ছিলো খোলা, তা দিলো পরিয়ে। কতো যে তা'র ভালো লাগছে এই রাত জাগতে, তা'র চোখের সামনে দিয়ে তা ভোর করে' দিতে। জীবনে সে যেন আজ খুঁজে পেয়েছে তা'র প্রেমের সার্থকতা—তা'র নারীত্বের অহঙ্কার। তা'র প্রেমেরই জন্যে নারীত্ব, নারীত্বের জন্যে প্রেম নয়। এই প্রেম, ইন্দ্রাণী দর্শনের ঘুমন্ত চোখের উপর থেকে হাওয়ায়-ওড়া দীর্ঘ চুলগুলি কপালের দুই পাশে সরিয়ে দিতে লাগলো, তা'র স্বামী, তা'র দর্শনের চাইতেও অনেক বেশি।

বারো

পরিচ্ছন্ন ছোট একখানি বাড়ি, একতলা, পাশাপাশি সমান মাপের তিনখানি কোঠা—সামনে দিয়ে, কোঠাগুলি ছুঁয়ে চলে' গেছে এক বারান্দা, তারপর খানিকটা দেয়াল-ঘেরা জমি পেরিয়েই রাস্তা। সেই জমির উপর টিনের একখানি ছোট রান্নাঘর, একপাশে কতোগুলি কলাগাছের ঝোপের মধ্যে কাঁচা একটি পাতকুয়ো। লতায়-পাতায় জমিটুকুর উপর স্নিগ্ধ ছায়া করা।

দু'জনের জন্যে জায়গা সেখানে অনেকখানি।

তক্তপোষ, টেব্‌ল্‌, চেয়ার—আস্তে-আস্তে দুয়েকটা করে' আসবাব আসতে লেগেছে: রান্নাঘরে ডেকৃচি, কড়া, খুন্তি-হাতা, ভাঁড়ারে হাঁড়ি-কুঁড়ি, শিশি-বোতল, দা-কুরুনি। বারান্দায় মোটা ক্যান্‌ভাসের দু'টো ইজিচেয়ার। একপাশের একটা ঘরকে করা হয়েছে বস্‌বার, টেব্‌লের উপর কতোগুলি বই, ইস্কুল থেকে পাওয়া গেছে দু'টি চেয়ার বেতের ও কাঠের, লণ্ঠন আর রিঙ্‌-ঝুলানো পর্‌দা। তারপর পাশাপাশি দু'টো ঘর শোবার—একটা ইন্দ্রাণীর, একটা দর্শনের। একত্রিত বিছানাটাকে

দ্বিখণ্ড করতে হয়েছে। দরকার হয়েছে তাই দু' প্রস্ত শয্যা এবং তা'র অনুষঙ্গ। ইন্দ্রাণীর ঘরের দেয়ালে বড়ো একটা আয়না, তা'র পাশে কুলুঙ্গিতে দাঁতন থেকে সুরু করে' তা'র চুলের ফিতে-কাঁটা, দেয়ালের কোণ ঘেঁসে দাঁড়িয়ে একটা আল্‌না, শাড়িতে-সেমিজে বোঝাই, আল্‌নার পা-দানিতে জুতো। ঘর-দোর তা'র হাসিতে-উদ্ভাসিত দাঁতের মতো ঝক্‌ঝক্ করছে। দর্শনের ঘরের দেয়ালগুলি একেবারে শাদা, তা'র বিরহের মতোই শুভ্র-শূন্য। কোথায় বা তা'র জামা-জুতো, কোথায় বা তা'র দাড়ি কামাবার সরঞ্জাম। কে বা এখন দেখে-শোনে, কে বা রাখে গুছিয়ে! ইন্দ্রাণীর এখন কতো কাজ। দিনের বেলায় সে ইস্কুলে, রাত্রে সে দর্শনের পাশের ঘরে। বিরানা জায়গা, একটু ভয় করে বলে' দু'ঘরের যাওয়া-আসার দরজাটায় সে খিল চাপায় না, কিন্তু মনে হয়, ভয় তা'র বেশি যেন এখন স্বামীকেই। সে আর এখন স্ত্রী নয়, শিক্ষয়িত্রী। স্বামীর চেয়ে এখন সে নিজেকে বেশি যত্ন করে, সাবধানে রাখে। এখন এই তা'র স্বতন্ত্র, সম্পূর্ণ হ'বার মহান স্বার্থপরতা।

তবু কল্‌কাতায় তা'র নিষ্কর্ম্মণ্যতার মাঝে দর্শন খানিক পূর্ণতা পাচ্ছিলো, কিন্তু এখানে এই বিশ্রামটা যেন একটা বোঝা, রাত্রিতে একটা দুঃস্বপ্নের চাপ: যাকে বলে, তা'কে বোবায় ধরেছে। কল্‌কাতায় তবু শরীরে-মনে সে একটা সক্রিয় উদ্বেগ অনুভব করতো, এখানে আগাগোড়া একটা ঠাণ্ডা, নিশ্চুপ, নিশ্চিন্ততা। সেখানে শত অভাব-অশান্তির মাঝে ইন্দ্রাণী ছিলো কাছে, বাহুবিলগ্ন, তা'র দেহ ছিলো সান্ত্বনার একটি শীতল

প্রবাহিনী, সে ছিলো তা'র অন্তরের অঙ্গ : এখানে যেমন, বলতে গেল্ল, ততো অভাব নেই, তেমন ইন্দ্রাণীও নেই ; এখানকার আবহাওয়া যেমন ঠাণ্ডা, তেমনি সমানুপাতে ইন্দ্রাণীও এসেছে জুড়িয়ে। ইন্দ্রাণী এখানে নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত, স্বয়ংপ্রধান, তা'র পরিচয় সে নিজে, তা'র অস্তিত্বের প্রমাণ তা'র এখন নিজের কর্ম্মোদ্‌যাপনে, এখন কারুর প্রতি তা'র সহানুভূতি দেখানো অর্থ করুণা দেখানো। সান্ত্বনায় যদি সে এখন নুয়েও আসে কোনোদিন, তবে সেটাকেও দেখাবে তা'র অহঙ্কারে একটা উদ্ধত ভঙ্গির মতো। ইন্দ্রাণীকে দেখবার দৃষ্টিকোণ এখন বদ্‌লে নিতে হচ্ছে।

কল্‌কাতায় থাকতে দর্শন কতো ভোরে উঠতো—টিউসানি থাক্ বা না থাক্। তা'র আলস্যভোগটা পরিবারের কাছে অশ্লীল একটা অপরাধ, তাই সব সময়েই ছিল তা'র একটা ব্যস্ততার ভাব—তা'তে ফল কিছু হ'লো বা না-ই হোলো। কিন্তু এখেনে কিছুই আর তাড়া নেই, যতোক্ষণ খুসি না ঘুমিয়ে শুয়ে থাকা যায়। ভোররাত্রের ঘুম কেউ আর গা ভরে' ঠেলা দিয়ে জাগিয়ে দিয়ে যায় না। আগে-আগে, কল্‌কাতায়, ইন্দ্রাণী যখন বিছানার পাশ থেকে উঠে পড়তো, তখন কেউ কিছু তা'কে না বলে' দিলেও সেই শূন্য শয্যা তা'কে বলে' দিতো, আর শুয়ে থাকার কোনো মানে নেই, এবার ওঠো। এখন জাগা না-জাগা তা'র সমান। শোয়া-ওঠাতে সমান পরিশ্রম। শুধু রোদ ওঠবার সঙ্গে-সঙ্গে ইন্দ্রাণী চায়ের বাটি করে' ঘরে ঢোকে, টিপয়ের উপর সেটা নামিয়ে রাখতে-রাখতে তা'কে একবার ডাকে, ছল করে'

ঘুমিয়ে থাকলে বা গায়ে একটু ঠেলা দেয়—শুধু সেইটুকুর জন্তে প্রতীক্ষা করতে দর্শন আরো খানিকক্ষণ চুপ করে' পড়ে' থাকে। সেই সময় ইন্দ্রাণী নিজেরো অলক্ষ্যে দর্শনের একটু সন্নিহিত হ'য়ে আসে। যতোটুকু সে না নিজে থেকে দেবে, তা'র অতিরিক্ত কিছু দাবি করবার যেন দর্শনের অধিকার নেই। মাঝে-মাঝে কোনো-কোনো অসতর্ক মুহূর্ত্তে সে আবিল, প্রগল্‌ভ হ'য়ে উঠতে চায়, কিন্তু নিজেরই কাছে তা'র করে ভীষণ লজ্জা, প্রেমকে দেখায় যেন একটা নির্লজ্জ, নির্জ্জলা কামনার মতো। ইন্দ্রাণীকে কাছে ডেকে আনার অর্থই হচ্ছে তা'কে তা'র মহিমার চূড়া থেকে নামিয়ে নিয়ে আসা, নিয়ে আসা দর্শনের এই পরাজয়ের গ্লানির মধ্যে; অর্থাৎ তা'র কাছে সে যেন তা'র অক্ষমতার ক্ষমা চায়, তা'র দৌর্ব্বল্যের চায় সমর্থন! তা'কে কাছে ডেকে আনায় যেন এখন কেবল কাতর ভিক্ষা, অশোভন লোলুপতা। ইন্দ্রাণীকে তাই ছুঁতেও তা'র এখন ভয় করে, পাছে প্রকাশ হ'য়ে পড়ে তা'তে তা'র প্রেমের দারিদ্র্য, শরীরের কাকুতি। পাছে তা'র আত্মদৌর্ব্বল্য আরো গভীর হ'য়ে ওঠে। তাই যতোদূর সম্ভব, নিজকে নিশ্চিহ্ন ও নিরুচ্চার করে' রাখাই দর্শনের কাজ। ইন্দ্রাণী যদি কোনোদিন মমতার ভারে বর্ষার মেঘের মতো আসে নুয়ে, যদি তা'র প্রবহমানতার আনন্দে দর্শনের তটদেশে দিয়ে যায় দু'টো ঢেউ। এখনো তা'র সেই প্রতীক্ষা, দেহের বাতায়নে মনের চোখ রেখে বসে' থাকা। তা, ইন্দ্রাণীর এখন মাত্র প্রেম করা ছাড়া আরো অনেক কাজ, অনেক বিস্তৃতি।

ই ন্দ্রা ণী

রোদ উঠে গেছে, দর্শন বিছানায় শুয়ে চোখ বুঝে ইন্দ্রাণীর সমস্ত দিনের মধ্যে প্রথম ও স্বতঃপ্রণোদিত স্পর্শটির জন্যে প্রতীক্ষা করছিলো।

আজকের ইন্দ্রাণীর পায়ের শব্দ অত্যন্ত দ্রুত, তা'র স্পর্শে আজ সেই অনুরাগের বিহ্বল মন্থরতা নেই। দর্শনের মাথাটা দুই হাতে ঝেঁকে দিয়ে সে বল্‌লে,—ওঠো, ওঠো শিগ্‌গির, বেলা কতো হ'লো খেয়াল আছে ?

স্পর্শটা এমন নয় যে দর্শন ধীরে-ধীরে চোখ মেল্‌বে। উঠলো সে ধড়মড় করে'।

ইন্দ্রাণীর চেহারা দেখে সে অবাক।

—এ কী, সকালবেলাই এতো সাজ-গোজ ?

ইন্দ্রাণীর শরীর খুসিতে উছলে উঠলো : হ্যাঁ, একবার স্কুলের সেক্রেটারির সঙ্গে দেখা করতে হ'বে। আমাকে আর হেডমিস্‌ট্রেস্‌কে ডেকে পাঠিয়েছেন। গাড়ি নিয়ে হেডমিস্‌ট্রেস্‌ হাজির। আর তুমি এখনো ওঠো নি।

দর্শন চোখ কচ্‌লে নিয়ে ইন্দ্রাণীকে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখতে লাগলো।

—আটটায় টাইম দিয়েছেন, ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই ফিরে আসবো, বুঝলে ?

দর্শন বল্‌লে—আমার চা ?

—নিজেই তৈরি করে' নিয়ো, কেমন ? ঝি-কে বলে' গেলাম জল গরম করে' দেবে। বুঝলে ?

ইন্দ্রাণী তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।

ইন্দ্রাণী

এক পেয়ালা চা তৈরি করে' খাওয়া এমন কিছু কঠিন কাজ নয়। কিন্তু এক বেলা চা না খেলেই বা কী! ইন্দ্রাণী সেই যদি তা'র ঘুম ভাঙাতেই এলো তো হাতে করে' এক পেয়ালা চা নিয়ে এলো না কেন?

অন্যায়, এই অভিমান দর্শনকে সাজে না। এতো সকালে ইন্দ্রাণীকে যদি স্কুলের জরুরি কাজে বেরুতে হয়, তবে আরেক পাট চা করবার তার সময় কোথায়? নিজের সাজসজ্জার আয়োজনের চাইতে তা'র জন্যে তুচ্ছ এক পেয়ালা চা করে' দেয়া তো বেশি দরকারি নয়।

দর্শন তা বুঝুক। সে কেবল ইন্দ্রাণীর উপর ভর করে'ই থাকবে, তা'কে করবে না সাহায্য, দেবে না সহযোগিতা—দর্শনের কাছে তা সে প্রত্যাশা করে না। মাত্র তো নিজের জন্যে এক পেয়ালা চা করে' নেয়া—তা'তে ইন্দ্রাণীর কতোটা অন্তত সময় বাঁচে।

সেদিন দর্শন হঠাৎ ভুল করে' চেঁচিয়ে উঠলো: আমার গেঞ্জি—গেঞ্জিটা গেলো কোথায়?

দর্শন একটু বাইরে বেরুবার উদ্যোগ করছিলো—ইন্দ্রাণী সবে স্কুল থেকে ফিরে জামা-কাপড় ছেড়ে বারান্দার ইজিচেয়ারে শুয়ে একটু বিশ্রাম নিচ্ছে।

দর্শনের গোলমালে সে কোনো গা করলে না।

—কোনো জিনিস যদি হাতের কাছে আজকাল খুঁজে পাই। জামার বোতাম সব ছেঁড়া, জুতোয় আজ তিনমাস ধরে' কালি পড়ে নি। দর্শন বারান্দায় চলে' এলো, মুখিয়ে

উঠলো ইন্দ্রাণীর উপর: আমার গেঞ্জিটা খুঁজে দিয়ে যাও দেখি।

ক্লান্তিতে তেমনি গা এলিয়ে রেখেই ইন্দ্রাণী বল্‌লে,—তুমিই তো আজ সেটা সাবান দিয়ে কাচ্‌লে দেখলাম।

—তবে কে আর কেচে দেবে আমার হ'য়ে? দর্শন অভিমানে মুখ ভার করে' বল্‌লে,—রোদ্দুরে শুকোতেও দিয়েছিলাম—এখন আর খুঁজে পাচ্ছি না।

ইন্দ্রাণী বল্‌লে,—নিজের সামান্য জিনিস নিজে গুছিয়ে রাখতে পারো না? এও আমাকে করে' দিতে হ'বে? এখন এই **tired** অবস্থায় আবার সব জিনিস-পত্র ওলোট-পালোট করতে বসি! তবে তুমি আছ কী করতে, সমস্ত দিন কী করো তবে? আমার জন্যে তোমার একটু মায়া করে না?

মায়ার কথা নয়, দর্শনের মনে হলো, এই সব তুচ্ছ কাজ আর মানায় না ইন্দ্রাণীকে। সত্যি তো, তারি তো বরং উচিত এখন ইন্দ্রাণীর শাড়ি-সেমিজ তদারক করা, হাতের কাছে জুতোটা-ছাতাটা এগিয়ে দেয়া, তা'র যাতে এতোটুকু ঠেকতে না হয়, সমস্ত ফিটফাট, গোছগাছ করে' রাখা। সমস্ত দিন সে করে কী! এখানে সে তবে কী করতে এসেছে?

দর্শন আর কোনো কথা বল্‌লো না। নিজেই সে তা'র গেঞ্জি খুঁজে পেলো। 'এও তাকে করে' দিতে হ'বে নাকি?' সে কি এই সব টুকিটাকি তুচ্ছতার জন্যে এইখানে মাষ্টারি করতে এসেছে? তা'র এতো সব বৃহৎ অনুষ্ঠানের মাঝে আবার একটা ছেঁড়া গেঞ্জি খুঁজে দেয়া! ককৃখনো না, দর্শন তা অনায়াসে বোঝে। জামার

বোতাম সে নিজেই লাগায়, রুমালগুলি সেই কেচে রোদ্দুরে শুকোতে দেয়। কল্‌কাতায় থাকতে ইন্দ্রাণী তা'র নরম, এলানো আঙুলগুলো দিয়ে কী করে' যে তা'র জুতোয় কালি লাগিয়ে দিতো তা সে ভাবতেই পারে না। এখন মুখ ফুটে সে-কথা উচ্চারণ করাও একটা বিভীষিকা, তা'র আত্মমর্য্যাদার উপর নিষ্ঠুর একটা বলাৎকার। জুতোয় এখানে কালি না লাগালেই বা কী! যে জায়গা, এখানে কোনোরকমে এক জোড়া জুতো জোগাড় করতে পারলেই যথেষ্ট। কে অতো দেখতে আস্‌ছে!

কে অতো দেখতে আসছে তা'র বিছানার চাদরটা কেমন নোংরা, ঘরে কেমন ধুলো। কেমন কতোগুলি কাজ তা'র নিজের জন্যে স্পষ্ট, নির্দ্দিষ্ট হ'য়ে উঠেছে। প্রয়োজনের রেখা টেনে-টেনে কেমন সে ইন্দ্রাণীর থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে আসছে দিন-দিন। বালিশের খোল ছিঁড়ে তুলো বেরিয়ে এলে দর্শনকেই নিতে হয় স্থঁচ-স্থঁতো—কেননা সেটা তা'র বালিশ। কর্ত্রীর হুকুমে ঝি ঘর ঝাঁট দিতে না এলে দর্শনকেই উচিত ঝাঁটা হাতে করা—কেননা সেটা তা'র ঘর। নিজের বিছানাটাও যদি সে নিজ হাতে পেতে রাখতে না পারে তো সমস্ত দিন সে করে কি!

তেমনি, সকালবেলা দর্শনকে জাগাতে এসে ইন্দ্রাণী একদিন দেখলে তক্তপোষের মনে তক্তপোষ আছে পড়ে', দর্শন মেঝের উপর একটা মাতুর পেতে ঘুমিয়ে আছে।

ইন্দ্রাণী হাঁটু মুড়ে তা'র শিয়রে বসে' পড়লো। রুক্ষ চুল ভরা মাথাটা তা'র কোলের উপর টেনে আনতেই দর্শন চোখ মেল্‌লো। ঘুমের সঙ্গে তা'তে অভিমানের ম্লানিমা।

ই ন্দ্রা ণী

ইন্দ্রাণী নুয়ে পড়ে' বল্‌লে,—এ কী, এখানে শুয়ে আছ কেন ?

মাথাটা কোল থেকে নামিয়ে নিয়ে দর্শন বল্‌লে,—তবে কোথায় শোবো ?

—কেন, বিছানা কী দোষ করলো ?

—শুকনো তক্তপোষের চাইতে মেঝেটা মন্দ কী! দর্শন উঠে বসলো : কে আবার ও-সব বিছানা-ফিছানা পাতে বলো, মশারি-ফশারি টাঙানোর কে অতো হাঙ্গাম করে। তা'র চেয়ে মেঝেতে শুয়ে পড়া অনেক সোজা।

ইন্দ্রাণী ব্যস্ত হ'য়ে বল্‌লে,—কেন, ঝি কাল বিছানা পেতে রাখেনি বুঝি ? ওটাকে দিয়ে কিচ্ছু কাজ হচ্ছে না, ওকে তুমি তুলে দাও।

দর্শন ঝাপ্‌সা গলায় বল্‌লে,—তোমার অসুবিধে হচ্ছে দেখলে একশোবার তুলে দেবে বৈ কি। আমি তা'র কী বলবো ?

প্রচ্ছন্ন খোঁচা খেয়ে ইন্দ্রাণী ছটফট করে' উঠলো : তুমিই বা কেমন ধারা শুনি, ভুলে একদিন বিছানাটা পাতা হয়নি বলে' একেবারে মেঝের ওপর গড়াগড়ি দিতে হ'বে ? নিজের বিছানাটা নিজে পাততে পারো না, কী এমন একটা হাঙ্গাম শুনি ? তোমাকে তো কেউ আর কুড়ুল দিয়ে গাছ ফাড়তে বলছে না। বিছানাটা শুধু টান করে' শুয়ে পড়া।

বলে' ইন্দ্রাণী নিজেই বিছানাটা এক হাতে মেলে ফেল্‌লো। বল্‌লে : সেই আমাকেই রোদ্দুরে দিতে হ'বে, আমাকেই বাছতে

হ'বে ছারপোকা! আমার দিকে তুমি তাকিয়ে একবার দেখতে পাও না—আমার সময় কোথায়?

বিছানাটা সম্পূর্ণ প্রসারিত করতেই তা'র দারিদ্র্য যেন অট্টহাস্য করে' উঠলো। তোষকের মধ্য থেকে তুলোর চাপগুলি এখানে-ওখানে ঠেলে উঠেছে, চাদরটা চিট্-ময়লা, বালিশের সেলাই খসে' গিয়ে তুলো পড়েছে বেরিয়ে।

—না, বিছানার এমন চেহারা, আমাকে পারো নি একবার বলতে! নতুন দু'টো বালিশ করে' নিলেই হয়! ইন্দ্রাণী ঝাঁজিয়ে উঠলো: না, কে তুলো ধোনে, কোথায় খেরো পাওয়া যায় এই সব আমাকেই খুঁজে বেড়াতে হ'বে নাকি? বিছানা ছিঁড়ে গেছে, আমাকে বলতে তোমার কী হয়েছিলো জিগ্‌গেস করি?

আগে-আগে, কল্‌কাতায় থাক্‌তে, যেমন কাপড় বা জামা ছিঁড়ে গেলে দাদাকে গিয়ে সে বল্‌তো। সব সময়েই ভয় থাকতো যদি তিনি বলতেন: না, এখন হ'বে না। তেমনি ভয়ে-ভয়ে, অপরাধীর মতো কুণ্ঠিত হ'য়ে দাঁড়িয়ে তা'কে ভিক্ষা চাইতে হ'বে। ইন্দ্রাণী হয়তো মুখের উপর না বলতো না, কিন্তু অনায়াসে বলতে পারতো: দাঁড়াও, সবুর করো আর দু'টো দিন, মাসের শেষ, হাতে এখন টাকা কই?

বিছানাটা বারান্দার রৌদ্রে টেনে নিয়ে যেতে-যেতে ইন্দ্রাণী বল্‌লে,—সব কাজ যদি আমার ওপর ছেড়ে দাও, আমি একা এতো দিক সামলাই কি করে'? হাত-পা গুটিয়ে যদি কেবল বসে'ই থাকবে, তবে তোমার জন্যে আলাদা একটা চাকর রাখো।

ইন্দ্রাণী তা'র কাছে এসে দাঁড়ালো: কী বলো? রাখবে একটা চাকর?

দর্শন দাঁতে ব্রাশ্ ঢুকিয়ে ফেনা করতে-করতে বল্‌লে,—তা'র আমি কী জানি! তোমার টাকা, তুমি কী ভাবে খরচ করবে তা'তে আমার কী বল্‌বার আছে?

তেরো

তবু যা হোক এতোদিন ইন্দ্রাণীই দু'বেলা রাঁধ্‌তো, প্রথমটায় এ ছাড়া উপায় ছিলো না। বল্‌তো: দু'টি লোকের তো মোটে রান্না, কতোক্ষণ আর সময় লাগবে। তোমাদের কল্‌কাতার বাড়িতে নিত্যি চলছে রাজস্থয় যজ্ঞ, সকাল বেলা হেঁসেলে ঢুকলে বেরিয়ে আস্‌তে সূর্য্যাস্ত—হাড়ে ঘুণ ধরে' যায়। এখানে আমার রান্না প্রায় একটা কবিতা লেখার মতো মধুর।

তবু যা হোক এইখেনে ছিলো ইন্দ্রাণীর সেবিকা, কল্যাণী মূর্ত্তি, তা'র দুই হাতে সেবার স্থষমা। কিন্তু সেই দিন সন্ধ্যা করে' স্কুল থেকে ফিরে এসে ইন্দ্রাণী হঠাৎ অন্ধকারে হাত ছুঁড়তে লাগ্‌লো: মাগো, এখন আবার উনুনের পাশে গিয়ে বসতে হ'বে ভাবলে গা জ্বলে' যায়।

কথাটা সত্যি, কিছুই এতে অভিমান করবার নেই। সারা দিন মেয়ে চরিয়ে এসে এখন যদি ফের তা'কে হাঁড়ি ঠেলতে হয়, তা হ'লেই একেবারে সোনায় সোহাগা। বাড়ি ফিরে সে-ই তো এখন প্রত্যাশা করে কেউ তা'র জন্যে নরম করে' বিছানা পেতে রেখেছে, তা'র ক্ষুধার্ত্ত মুখের কাছে এনে ধরেছে যা-হোক

কিছু জলখাবার। একেক সময় ক্লান্তিতে এতো সে ভেঙে পড়ে যে আল্না থেকে আটপৌরে শাড়িটা পর্য্যন্ত হাত বাড়িয়ে টেনে নিতে ইচ্ছা করে না, কেউ বেশ আগে থেকেই চেয়ারের হাতলের উপর ভাঁজ করে' গুছিয়ে রেখে দেয়, তো কাপড় ছাড়তে তা'র একটুও আলস্য হয় না। তা না, গাড়িও চালাতে হ'বে তা'কে, মোটও তা'কেই বইতে হ'বে। কুলি আর মেকানিক্, একাধারে তা'রই দুই মূর্ত্তি। মাত্র খাদ্য জুগিয়ে তা'র নিস্তার নেই, আবার তা নিজ হাতে করতে হ'বে পরিবেষণ। স্কুলে সারাদিনের এই খাটা-খাটনির পর এখন আবার ঘর-দোর সাফ করো, সন্ধ্যা দাও, হাঁড়িতে জল চাপাও। সব তা'র একহাতে একলা করতে হ'বে, কারু কাছে কিছু প্রত্যাশা করা যাবে না। একেকদিন কোনো স্কুল-সংক্রান্ত কাজের ফিকিরে পড়ে' ফিরতে তা'র হয়তো দেরি হ'য়ে যায়, যখন প্রায় সন্ধ্যার অন্ধকার এসেছে ঘনিয়ে। এসে দেখে এক ফোঁটা আলো নেই, অথচ বারান্দায় চেয়ার টেনে দর্শন দিব্যি নিশ্চিন্ত হ'য়ে আকাশে তারার উদয় দেখছে। ইন্দ্রাণী না এলে নিজে যেন সে আর লণ্ঠনগুলি জ্বালিয়ে নিতে পারে না। ইন্দ্রাণীর উপর তা'র এক রতি মায়া নেই; থাকলে, এরো পর নিজেকে আর সে অমনি অন্ধকারে প্রচ্ছন্ন, নিরুচ্চারিত রাখতে পারতো না। ঝি একটা আছে বটে, কিন্তু বিকেলের কাজকর্ম্ম সেরে সে সেই যে তা'র ঘরে চলে' যায়, আসে ফের পর দিন ভোর বেলা। বিকেলের পর থেকে অনেক রকম ছোটখাটো কাজ এখানে-ওখানে উঁকি মারতে থাকে। দর্শন তা দেখে না, হাত গুটিয়ে বসে' আছে তো বসে'ই আছে।

ইন্দ্রাণী

কখন স্কুল থেকে ইন্দ্রাণী ফিরবে, কখন সে আবার বসবে তা'র সংসার নিয়ে। যেন তারি কেবল একলার সংসার, যতো দায়-দাবি যেন তা'রি। কেন বাপু, দর্শন তো ঠায় বেকারি বসে' আছে, এ-দিক-ও-দিক ত্থু'-একখানা কাজ সেরে রাখলে ক্ষতি কী! পুরুষ হ'য়ে সামান্য কতোগুলি কয়লা সে ভেঙে রাখতে পারে না, না, ঘর-দোর একটু সাফ করে' রাখলেই তা'র জাত যায়? ষ্টোভটা ধরিয়ে বিকেলের চা-টাও তো অনায়াসে করে' ফেলতে পারে—বাড়িতে পা দিয়েই যদি ইন্দ্রাণী তৈরি এক পেয়ালা চা পায়, উঃ, ভাবতেও কী রোমাঞ্চ হচ্ছে! তা না, সব এসে ইন্দ্রাণীকেই করতে হ'বে: উন্থন ধরানো, বিকেলের জলখাবার তৈরি করা, আরো কতো-কি টুকিটাকি, তা'র লেখাজোখা নেই। দর্শন কুটোটি কেটে ত্থু'খান করবে না; কাজের ভাগ নেবে না, করবে কেবল আরামের কায়েমি ভোগ—এই বুঝি সহযোগিতা, তা'র ভালোবাসা! গাড়ি টেনে এসে আবার এখন তা'কে নাকে দড়ি দিয়ে সংসারের ঘানি ঘোরাতে হ'বে! কেন, কিসের জন্যে? নিজের বিছানাটাও পেতে রাখতে যার সম্মানে বাধে, কোথায় তা'র গেঞ্জি-রুমাল যাকে প্রতিপদে খুঁজে দিতে হয়, তা'র নিষ্কর্মণ্যতার উপর ইন্দ্রাণীর আর শ্রদ্ধা নেই। দিবারাত্র পায়ের উপর পা তুলে বসে' কেবল হাই তুলবে আর তুড়ি দেবে, আর নিজে সে অনবরত চরকির মতো ঘুরে মরবে কাজের আবর্তে—এ অসম্ভব। নিজে সে রোজগার করবে এতো পরিশ্রম করে', আবার তা'কেই থাকতে হ'বে বঞ্চিত, এর মাঝে শ্রমের খুব বেশি মহত্ত্ব নেই। নিজে

যখন সে রোজগার করছে, তখন অনর্থক আর সে কষ্ট স্বীকার করতে পারবে না।

শাড়ি-সেমিজ বদ্‌লে ইন্দ্রাণী দর্শনের কাছে এসে বস্‌লো আরেকখানা চেয়ার টেনে। খোলা চুলের মধ্যে হাল্‌কা করে' চিরুনি চালাতে-চালাতে বল্‌লে,—এখন আবার গিয়ে উনুনের পাশে বসতে হ'বে ভাবলে গায়ে জ্বর আসে। বড়ো জোর, টেনে-বুনে চা দু' কাপ্‌ করা যায়, কিন্তু রান্না? আমার শরীরে আর দিচ্ছে না। একটা ঠাকুর রাখবো ভাবছি, কী বলো?

দর্শন উদাসের মতো বল্‌লে,—তোমার সুবিধে হ'লে রাখবে বৈ কি, আমাকে জিগ্‌গেস করা বৃথা।

—ঠাকুর রাখাটা তুমি দরকারি মনে করো না?

—আমার মনে করায় না-করায় কী এসে যায়? তুমি দরকার বুঝলে রাখবে, তা'তে কারুর তো কিছু বলবার থাকতে পারে না।

ইন্দ্রাণী গম্ভীর মুখ করে' বল্‌লে,—হ্যাঁ, ইস্কুলের খাট্‌নির পর রান্না আর আমাকে পোষাবে না। অন্ন প্রস্তুত করার চাইতে আমার এখন অন্ন সংস্থান করার কাজ। আর শোনো, ঐ বিলাসিনী ঝিকে দিয়ে চলবে না, একটা হোল্‌-টাইম চাকর রাখবো ভাবছি। যতো লাগবে লাগুক, প্রতিমুহূর্তে জিনিস-পত্রের পিছু আর আমি ধাওয়া করতে পারি না। দর্শনের মুখের উপর এক ঝলক তরল দৃষ্টি ফেলে ইন্দ্রাণী খুসির সুরে জিগ্‌গেস করলে: কী বলো, তাই ভালো হ'বে না?

চাপা ঠোঁটের কোণ দু'টো বিদ্রূপে ঈষৎ তীক্ষ্ণ করে' দর্শন বল্‌লে,—ভালো-মন্দের আমি কী বুঝি? তোমার

টাকা, যেমন ভাবে খুসি তুমি খরচ করবে, তা'তে আমার কী বল্‌বার আছে?

কথাটার ঝাঁজ ইন্দ্রাণীর রক্তে যেন আগুন ধরিয়ে দিলো। ঘাড়টা একটু বেঁকিয়ে ধারালো গলায় সে বল্‌লে,—এর মাঝে তুমি কেবল খরচ দেখছ, প্রয়োজন দেখছ না? খেটে-খেটে আমি এমনি মরে' যাই এই বুঝি তুমি চাও? কল্‌কাতায় থাকতে তো মহাত্মার কতো মায়া উথলে উঠতো দেখতাম!

ঠোঁটের উপর নিরানন্দ একটি হাসির রেখা টেনে দর্শন বল্‌লে,—পাগল! তুমি মরে' গেলে আমার চলবে কেন? আমি এমন কী একেবারে মন্দ কথা বললাম! তোমার স্থবিধে বুঝলে যতোটা না কেন পাইক-পেয়াদা রাখো—আমি বল্‌বার কে?

ইন্দ্রাণী চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো: নিশ্চয়, রাখবোই তো। কিন্তু চাকর-ঠাকুর তুমি খুঁজে আনতে পারবে?

ঠোঁট উল্‌টে দর্শন বল্‌লে,—চেষ্টা করে' দেখবো'খন।

—থাক্‌, তোমাকে আর কষ্ট করে' চেষ্টা করতে হ'বে না। দাঁতে ফিতে চেপে ধরে' ইন্দ্রাণী বল্‌লে,—আমিই পারবো, আমাদের ইস্কুলের বেয়ারাটাই জোগাড় করে' দিতে পারবে।

—জানি। দর্শন ম্লান, পীড়িত মুখে বল্‌লে,—আমি তোমাদের ইস্কুলের বেয়ারাটার চেয়েও অপদার্থ, এ-কথা এতো স্পষ্ট করে' ইঙ্গিত না করলেও পারতে। আমি জানি, আমি তা জানি, ইন্দ্রাণী।

সেখানে থেকে পিছ্‌লে ইন্দ্রাণী ঘরের মধ্যে চলে' গেলো। কথাটার সে একটা প্রতিবাদ করে' গেলো না, বরং যাবার সময়

পিচ্ছল, ছিপ ছিপে শরীরে যে-রেখা ফুটে উঠলো তা'তে উচ্চারিত হ'লো যেন তা'র সম্মতির সঙ্কেত।

ইন্দ্রাণী ধীরে-ধীরে সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে এলো। তা'র এখন আলাদা রূপ, আরেক রকম চেহারা। শুধু ব্যবহারে নয়, চেহারায় পর্য্যন্ত এসেছে তা'র নতুন পরিবর্ত্তন, এমন-কি প্রসাধনের পারিপাট্যে। আগের মতো ঘোমটা ও আঁচল এলো রেখে সে শাড়ি পরে না, এখন চুলে-কাঁধে আনাচে-কানাচে বিদ্ধ হচ্ছে সব সেফ্‌টিপিনের ডাঁট। শরীরের সঙ্গে লেপ্‌টে শাড়িটা আজকাল কেমন সে যেন আঁট করে' পরে, ঝুল্‌টা অনেক উঁচুতে আসে উঠে, বালির উপর নদীর ছোট-ছোট ঢেউয়ের মতো শাড়ির পাড়টা পায়ের সঙ্গে জড়িয়ে-জড়িয়ে আর খেলা করে না। পিঠের উপর খেলা করে না তা'র বেণী, এখন তা স্তূপীকৃত হ'য়ে উঠেছে খোঁপায়: লীলা রূপান্তরিত হয়েছে মন্থরতায়। পায়ে আর সেই হাল্‌কা লপেটা নেই, এখন খুর-তোলা ভারি জুতো। শাড়ির আঁচলে আর সেই আলস্য নেই, পায়ে নেই আর সেই গতির স্ফূর্ত্তি। সোনার হাল্‌কা চশমাটিতে তা'র মুখখানিকে আগে কেমন টুকটুকে দেখাতো, সোনালি মেঘে-মাখা সন্ধ্যার এক টুকরো আকাশ: এখন তা'র বদলে পরেছে সে গগল্‌স্‌, কালো মেঘে থম্‌থম্‌ করছে যেন ঝড়। আর কমনীয়তা নয়, এখন গাম্ভীর্য্য, নির্লিপ্ত, নিরবকাশ গাম্ভীর্য্য। সেই লঘু, অনায়াস, সব সময়ে সেই আকস্মিক ক্ষিপ্রতার বদলে এখন প্রতিপদে তা'র হিসেব, প্রতিপদে তা'র আত্মকর্ত্তৃত্বের গরিমা। তা'র শরীরে লাবণ্যস্রোতের ধার যেন ধীরে-ধীরে ক্ষয়ে' যাচ্ছে,

তা'র আভিজাত্যবৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে ধীরে-ধীরে রাশীভূত হ'য়ে উঠছে মাংসলতা। মর্চে পড়ে'-পড়ে' তলোয়ার ভোঁতা হ'য়ে-হ'য়ে যেন একটা দা হ'য়ে উঠছে। গালের উপর পেশী উঠছে ফুলে, চিবুকে পড়ছে ভাঁজ, সেই বেদিবিলগ্নমধ্যা, কৃশকটি ইন্দ্রাণীর সেমিজে-পেটিকোটে আজকাল আধ গজ করে' বেশি কাপড় লাগছে। তা'র মুখের সেই স্বতঃস্বচ্ছ, নির্ম্মল, প্রসন্ন আভাটি কবে অস্ত গেছে, তা'র বদলে সেখানে এখন মাংসময় স্তব্ধতা। তা'র চোখের চঞ্চল কৌতূহল গেছে নিভে', এখন দৃষ্টিতে তা'র আত্ম-সচেতনতার কঠিন ঔজ্জ্বল্য। মুঠিভরা আর আলিঙ্গনের শিথিলতা নয়, আলিঙ্গনকে প্রত্যাহার করবার কঠোরতা। ইন্দ্রাণীর এখন আলাদা রূপ, আরেকরকম চেহারা। প্রতি নিশ্বাসে সে আত্ম-উদ্বুদ্ধ, প্রতি পা-ফেলায় সে আত্ম-প্রতিষ্ঠিত। সে এখন বুঝেছে তা'র নিজের মূল্য, জেনেছে তা'র অপার প্রয়োজনীয়তা—তা'র গরিমার তাই শেষ নেই। জীবন নিয়ে তুচ্ছ রঙিন বিলাসিতায় মত্ত হ'বার তা'র সময় কোথায়, তা'কে অর্জ্জন করতে হচ্ছে স্থূল, দিনানুদৈনিক জীবিকা—সে নিরুপায়, বিলাসের চেয়ে কর্ত্তব্য তা'র এখন বড়ো লক্ষ্য: ইন্দ্রাণীর মুখে-চোখে, কথায়-স্তব্ধতায় কেবল এই তেজস্বী অহঙ্কার। কে জানে এই তা'র একটা ব্যসন কি না—এই তা'র আত্মমূল্যবোধ! সে আর ইন্দ্রাণী নয়, সে একটা মাষ্টারনি।

দর্শন যেন তা'কে আর ঠিক চেনে না, ইন্দ্রাণীর দিকে চোখ ভরে' তাকাতে তা'র ভয় করে। তুমি আশা করতে পারো না এই মেয়ে তোমার জন্যে থালা ভরে' ভাত বাড়বে, ফুল-তোলা

বালিশের ওয়াড়ে মেখে রাখবে ঘুমের কোমলতা, যতোক্ষণ তুমি না খাচ্ছ, ততোক্ষণ মুখে এক ফোঁটা জল তুলবে না। কী করে' বা তা তুমি প্রত্যাশা করতে পারো, স্বার্থপর, নিষ্কর্ম্মা, মূর্খ কোথাকার। বাড়িতে উনুনের আঁচে ইন্দ্রাণীর চোখ খারাপ হচ্ছিলো, এখন কিনা নিজ হাতে তা'কে ঠেলে আনতে চাও সেই কয়লার ধোঁয়ায়। তা'র সাড়ে-দশটায় যখন স্কুল করতে হয়, তখন কি করে' তুমি আব্‌দার করতে পারো যে তোমার জন্যে ভাতের থালা নিয়ে সে বসে' থাকবে! তারপর কি না ঘুমের কোমলতা! সামান্য উদরের ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্যে যার উপর নির্ভর করতে হচ্ছে, তা'র দেহের দুয়ারে গিয়ে আবার হাত পাততে তা'র লজ্জা করা উচিত। ইন্দ্রাণীকে সাহায্য করা দূরে থাক, সে শুধু বিস্তার করতে চায় তা'র বাধা, সঙ্কীর্ণ করে' আনতে চায় তা'র পরিধি। ছি ছি, তা'র চেয়ে সে আত্মহত্যা করে না কেন?

ইন্দ্রাণী এখন নাকে-মুখে পথ পাচ্ছে না, সে এখন বসবে কি না দর্শনের সেবাদাসীত্ব করতে! ঢের ভালোবাসা হয়েছে, এখন দেয়া যাক তা'র একটা জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ—দর্শনের জন্যে এই তা'র জীবিকা-সংগ্রহের সংগ্রাম, এই তা'র চাকৃরি। কিন্তু দর্শনের মনে হয়, ইন্দ্রাণী কেবল নিজেকেই ভালোবাসে, ভালোবাসে নিজের বলশালী ব্যক্তিত্বকে, ভালোবাসে নিজের স্বাধীন স্বাতন্ত্র্য। এরি জন্যে, নিজের বিস্তৃততরো প্রসার ও উজ্জ্বলতরো প্রকাশ পাবার জন্যেই সে বাধার পর বাধা এসেছে পেরিয়ে, এক তরঙ্গচূড়া থেকে বিস্ফারিত হ'য়ে পড়েছে চেতনার আরেক উর্শ্মি-উচ্ছ্বাসে। সে যেন পৃথিবীতে এতোদিনে পেয়েছে তা'র অপরিমিত

স্থান, তা'র গভীরতরো পরিচয়। গিরিগুহার প্রচ্ছন্ন অন্ধকার থেকে তা'র এই বেগোচ্ছল নির্বাধ নির্ঝর-যাত্রা। কে এখন গৃহকোণে উনুনের পাশে বেরালের মতো জবুথবু হ'য়ে ঘুমিয়ে থাকবে? শুধু টিচারি নয়, ইন্দ্রাণী এখানে মেয়েদের মধ্যে স্থাপন করেছে তা'দের কল্‌কাতার 'যুগনারী-সমিতি'র একটা শাখা: বাড়ি-বাড়ি গিয়ে করছে তা'র সভ্য, কুড়োচ্ছে তা'র চাঁদা, গলা ঝাঁকিয়ে দিচ্ছে চোখা-চোখা লম্বা বক্তৃতা। কাজ দিয়ে মুহূর্ত্তগুলি তা'র ঠাসা, সপ্তাহে একটা করে' রবিবার, সেদিন সে সারাদিন ঘুরে-ঘুরে গানের টিউসানি করে। আড়মোড়া ভেঙে শুধু একটা হাই তোলবারো সময় নেই। সারা দিন-রাত্রে তা'র আশে-পাশে কোথাও নেই দর্শনের এক ইঞ্চি জায়গা। দিনে যদি বা তা'র কাজ, রাত্রে তা'র ক্লান্তি: দিনে যদি বা তা'র কাজের আনন্দ, রাত্রে তা'র এই ক্লান্তির আরাম।

আগে-আগে, এখানে এসেও, ইন্দ্রাণী যা করতো, দর্শনের মত নিয়ে করতো, যেখানে যেতো, থাকতো সেখানে অন্তত দর্শনের একটা মৌখিক অনুমতি। বাধা দিলে অবিশ্যি কোনো ফল হ'তো না, তেমনি বাধা দেবার দরকারো থাকতো না কোনো। 'অমুক জায়গায় যাচ্ছি'—ব্যস্, মুখে এইটুকু বলে' গেলেই যথেষ্ট। এখন যেন সেইটুকু সৌজন্যও আর সমীচীন নয়। যখন খুসি, যেখানে খুসি, ইন্দ্রাণী বেরিয়ে যায়; ফিরে এসে ইচ্ছে হ'লে বলে, ইচ্ছে হ'লে বা বলে না—কোথায় সে গেছলো। দর্শনেরই আর তা শোনবার কৌতূহল নেই। ইন্দ্রাণীকে ফিরে আসতে দেখে নিজেই সে এখন অন্য ঘরে উঠে যায়। ইন্দ্রাণীর এখন অনেক

কাজ, অবাধ স্বাধীনতা। নিজের প্রকাশের প্রাচুর্য্যে সে দর্শনকে পর্য্যন্ত অতিক্রম করে' গেছে। হাত বাড়িয়ে আর তা'র নাগাল পাওয়া যাচ্ছে না। দর্শনের মাঝে-মাঝে সন্দেহ হয়, একেই কি সে একদিন এতো ভালোবেসেছিলো, এই একেই? হয়তো বা ইন্দ্রাণীর মনেও এই সন্দেহ আসছে, এই দর্শনকেই কি সে দিতে চেয়েছিলো তা'র প্রেম, তা'র দেহের নৈবেদ্য—এই পরাঙ্মুখ, নিরুত্তাপ, নির্লজ্জ দর্শনকে? কিন্তু, চোখ খুলে দেখতে গেলে, ইন্দ্রাণীর বিরুদ্ধে কিছুই তা'র অভিযোগ করবার নেই, না, যা সে করছে, শুধু দর্শনের জন্যে, শুধু দর্শনের অক্ষমতার ক্ষতিপূরণ করতে। ভাগ্যিস সে ইন্দ্রাণীকে বিয়ে করেছিলো।

কো-অপারেটিভ সোসাইটি থেকে কা'রা এসেছে মেয়েদের মধ্যে ম্যাজিক-লণ্ঠনে বক্তৃতা দিতে—ইন্দ্রাণী যখন রাত করে' ফিরে এলো, দর্শন তখন খেতে বসেছে। ইন্দ্রাণীকে দেখেই মুখের গ্রাসটা থালার একপাশে থুতিয়ে ফেলতে-ফেলতে দর্শন বিকৃতকণ্ঠে চীৎকার করে' উঠলো: ছোঃ! এ কখনো মানুষে খেতে পারে? ছাইপাঁশ এ কী রেঁধেছ, ঠাকুর?

কোনোদিন কিছু হয় না, আজ হঠাৎ কী গোলমাল হ'লো—ঠাকুর মুখখানি বেচারা করে' বল্‌লে,—কী হ'লো, বাবু? তরকারিতে বেশি নুন পড়ে' গেছে?

—তরকারিতে? কোন্‌টা তুমি রাঁধ্‌তে পারো শুনি? এ-সব খোট্টাই অজবুকের হাতে ভদ্রলোক খেতে পারে? তরকারির বাটিটা সামনের দিকে ঠেলে দিয়ে দর্শন মুখ খিঁচিয়ে

উঠলো : এ কি তরকারি কোটা হয়েছে, না, গরুর জাব্‌না? যেমন জুটেছেন হনুমান, তেমনি আবার তাঁর জাম্বুবান।

ইন্দ্রাণী রান্নাঘরের বারান্দায় উঠে এলো। ভারিক্কি চালে বল্‌লে,—এতো চেঁচামিচি সুরু করলে কেন?

—যাও, যাও, তুমি রান্নাঘরে আস্‌ছ কি, তোমার স্বাস্থ্য খারাপ হ'য়ে যাবে যে। দর্শন এক পশ্‌লা বিদ্রূপ বৃষ্টি করে' উঠে পড়লো : এ সব নিয়ে তোমার মাথা ঘামানো সাজে? তুমি গিয়ে বিশ্রাম নাও, এ-সব রান্নাবান্না তুমি দেখবে কী? দর্শন ঠাট্টায় হঠাৎ জিভ কাট্‌লো : ছি!

ইন্দ্রাণী দর্শনের দিকে এক মুহূর্ত্ত স্থির, কঠোর চোখে চেয়ে রইলো; গম্ভীর গলায় বল্‌লে,—নিশ্চয়, রান্নাবান্না আর আমাকে সাজে না বলে'ই তো মাইনে দিয়ে ঠাকুর রেখে দিয়েছি। কথা বলার সঙ্গে-সঙ্গে শরীরে সে একটা দৃপ্ত ভঙ্গি আন্‌লো। ঠাকুরের কাছে এক পা এগিয়ে এসে জিগগেস করলে : কী হয়েছে, ঠাকুর?

অভিযোগটা ইন্দ্রাণী ঠাকুরের মুখের থেকেই শুন্‌বে, কেননা সে তা'র মাইনে-করা চাকর—ইন্দ্রাণীর প্রশ্নের ভঙ্গিমায় যেন সেই স্পর্দ্ধা।

ঠাকুর চোখ নামিয়ে বল্‌লে,—আমার রান্না বাবুর পছন্দ হয় না।

—পছন্দ হয় না, ইন্দ্রাণী আপন মনে গজ্‌গজ্‌ করতে-করতে ফিরে গেলো : নিজে রান্না করলেই হয় তবে। মেয়েদের থেকে বাবুর্চ্চিরা তো ভালোই রাঁধে, কতোই তো বড়ফট্টাই শুন্‌তাম

আগে, নিজে রান্না করে' একবার দেখালেই হয়। কিছু কাজকর্ম্ম তো আর করতে দেখি না, ফাইন আর্ট হিসেবে রান্নাটা অন্তত শিখ্‌লে মাস্-মাস এতোগুলি অপব্যয় হয় না।

দর্শনের যে একদম খাওয়া হ'লো না, তা'তে ইন্দ্রাণীর এক ফোঁটা অনুশোচনা নেই। নিজের ঘরে চলে' এসে কাপড় ছাড়তে-ছাড়তেও ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে সে এই কথারই পুনরাবৃত্তি করে' চলেছে: মন্দ কী, এই ভাবে আমাকে সাহায্য করতে পারলে বুঝতাম একটা যা-হোক কাজের মতো কাজ করলো। উনি চাকরি করলে আমি বসতাম না হাঁড়িকুঁড়ি নিয়ে? উল্‌টো বিধানটাই বা চল্‌বে না কেন? গলদ্‌ঘর্ম্ম হ'য়ে এতো খেটে এসে আবার আমি হেঁসেল করতে যাই, আর উনি নবাব-পুত্তুরের মতো গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়ান।

পাশের ঘরে দর্শনের উপস্থিতিকে ইন্দ্রাণী খুব অল্পই গ্রাহ্য করছে: এদিকে কর্ম্মের গোঁসাই, তা'র আবার পছন্দের বহর দেখ না। তবু যদি বুঝতাম—

কথাটা শেষ না করে'ই সে রান্নাঘরের বারান্দা থেকে হাঁক দিলো: ঠাকুর, ভাত দাও শিগ্‌গির, আমার ভীষণ খিদে পেয়েছে।

আসনের উপর সে আঁট হ'য়ে বসলো, চাকর দিয়ে গেলো গ্লাশে করে' জল ভরে'। তা'রই পাশে যে একথালা অভুক্ত ভাত পড়ে' আছে, একখানা শূন্য, পরিত্যক্ত আসন, তা'তে তা'র দৃক্‌পাত নেই। আর কেউ উপবাস করে' আছে বলে' সে নিজের ক্ষুধা মেটাবে না—এই দুর্ব্বল অস্বাস্থ্য ইন্দ্রাণীর নয়।

চোদ্দ

গানের টিউসানিগুলি যোগ দিয়ে ইন্দ্রাণীর এখন, তাদের দু'জনের দিক থেকে বল্‌তে গেলে, অনেক পয়সা। হিসেবের ফর্দ্দটা সে নিজ হাতেই ছকে' দেয়, ক্যাশবাক্সের চাবিটাও রাখে সে নিজের হেপাজতে। নিজের নামে হাজার দুয়েক টাকার সে একটা লাইফ-ইন্‌সিয়োর পর্য্যন্ত করেছে, নিজের নামে,—আর কারু চেয়ে তা'র জীবনের দাম কিছু কম নয়।

যে ব্যায়াম করবে তা'র যেমন চাই পরিপুষ্টিকর খাদ্য, তেমনি যে অর্থোপার্জ্জন করবে তা'র চাই অর্থব্যয়ের সুবিস্তীর্ণ সুবিধে। সেদ্দিক থেকে ইন্দ্রাণী প্রায় উচ্ছৃঙ্খল। এতোটুকু শারীরিক অপরিচ্ছন্নতা বা সাংসারিক অসামঞ্জস্য সে সহ্য করতে পারে না—এখন, অর্থাৎ যখন সে নিতান্ত টাকা রোজগার করতে পারছে। এখনো যদি তা'কে কষ্ট করতে হয়, তবে কষ্ট করে' সে আর চাকরি না করলেই তো পারে। এই তো তা'র সময়, সূর্য্য থাকতে-থাকতে ধান কাটবার দিন। না, এই সূর্য্যকে ইন্দ্রাণী অস্ত যেতে দেবে না।

ই ন্দ্রা ণী

ইন্দ্রাণীর এখন ছ'-সেট্ ধোপা—কে একজন কখন দেরি করে' বসে তা'র ঠিক কী! সব সময়েই বাইরের জন্যে যাকে ফিট্‌ফাট থাকতে হয়, তা'র চাই বস্তায়-বস্তায় শাড়ি-ব্লাউজ, একদিনের সাজ ফের পরের দিনে টেনে আনা ঠিক একই বাক্যে একই শব্দ পর-পর ব্যবহার করার মতো লজ্জাকর। দিনান্তর তার শাড়ির রং ও ব্লাউজের কাট্ বদ্‌লাতে হয়। নিচের ক্লাসে গগল্‌স্, উপরের ক্লাশে প্যাস্‌নে: তা'র জুতোরো চাই অনেকগুলি প্যাটার্ন। একেকদিন একেকরকমের ভ্যানিটি ব্যাগ। শুধু বাইরের জন্যেই নয়, ঘরেও তা'র উপকরণের পাহাড় জমে' উঠেছে। লণ্ঠনের বদলে পেট্রোম্যাক্স, তক্তপোষের বদলে পালঙ্ক, চার পায়ার উপরে দাঁড় করানো কেরোসিনের তক্তার বদলে সবুজ বনাতে মোড়া সেক্রেটারিয়েট্ টেব্‌ল্। এটা-ওটা প্রসাধনের সরঞ্জামে প্রায় একটা হাট বসানো হয়েছে। সামান্য পা-পোষ থেকে স্থরু করে' নেটের মশারি পর্য্যন্ত সব তা'র নতুন, কাচের আলমারিতে ঝক্‌ঝক্ করছে চীনেমাটির বাসন, শ্বেত-পাথরের হিজিবিজি। সেল্‌ফ-এ ভরা ঝক্‌ঝকে বই—ব্লু-রিবন্-বুক্‌সের লম্বা ডলার-সিরিজ্‌টা, খ্যাত-অখ্যাত যা যখন তা'র মনে ধরে। রাখতে হয় তা'কে মোটা দেখে গোটা দুই বাঙলা মাসিক পত্রিকা: তা'র বাড়িতে অমুক কাগজ আসে পাড়া-পড়শীদের কাছে তা'তে বেড়ে যায় বিদ্যার ততো না-হোক, অর্থের মর্য্যাদা। পত্রিকা শুধু রাখলেই চলবে না; ছ' মাস পুরলেই আবার তা বাঁধিয়ে রাখতে হ'বে সোনার জলে তা'র নাম খোদাই করে'। এমনি তা'দের উপর তা'র যত্ন। আগে-আগে খরচের

তালিকাটা ইন্দ্রাণী দর্শনকে দিয়ে চেক্ করিয়ে নিতো, কিন্তু তা'তে ব্যয়নির্ব্বাহপর্ব্বটা সুসম্পন্ন হ'তো না, তালিকাটা সঙ্কীর্ণ করবার জন্যে দর্শন তা'তে নিক্ষেপ করে' বসতো, ইন্দ্রাণীর কাছে, যা মনে হ'তো, তা'র বর্ব্বর কৃপণতা। অর্জ্জনে যে উদার নয়, ব্যয়ে সে বদান্য হ'বে কী করে'? তাই দর্শনকে কিছু জিজ্ঞাসা করবার তা'র প্রয়োজন নেই। তা'র নিজের কিছু অসুবিধে হচ্ছে এ-কথা সে মুখ ফুটে বলুক দেখি না একবার। তা যখন হচ্ছে না, তখন আগে সে মাথা না ঘামালেও কিছু ক্ষতি হ'বে না। কতো রোজগেরে স্বামী কতো দিকে যে টাকা উড়োয় তা'তে পতিপ্রাণারা কী বলতে আসে! ইন্দ্রাণীর বেলায় দর্শনের এ-প্রভুত্ব না খাটালেও চল্‌বে—সংসার চলবে স্বচ্ছন্দেই। টাকার উপর মায়া দেখানোরো একটা সীমা আছে—তা যখন আবার নিজের টাকা নয়। না, দর্শন কিছু বিশেষ আর বলতে আসে না, সে নিজের আলস্য নিয়েই মশ্‌গুল। শুধু ইন্দ্রাণী যে নাম শুনেই যা-তা গুচ্ছের কতোগুলি বই আনায় কল্‌কাতার দোকান থেকে, তা'র জন্যেই তা'র দুঃখ হয়, আলস্যবিনোদনের জন্যে এক পৃষ্ঠাও তা'দের উল্‌টোনো যায় না বলে' গা জ্বালা করে।

মাসের মাইনে পেতেই ইন্দ্রাণী দর্শনের কাছে গিয়ে হাসিমুখে জিগ্‌গেস করলে: এ মাসে তোমার কী লাগবে বলো?

দর্শন কোলের বইর উপর চোখ নামিয়ে বল্‌লে,—কিছু না।

—কিছু না? সে কী কথা? দর্শনের প্রসাধনের ছোট টিপয়টা ঘাঁট্‌তে-ঘাঁট্‌তে ইন্দ্রাণী বল্‌লে,—অন্তত এক প্যাকেট ব্লেড্, কেক্-তুই সাবান?

বইর অক্ষরে চোখ ডুবিয়ে রেখে দর্শন বল্‌লে,—দরকার নেই। দাড়ি রাখি কি কামাই কিছুই এখানে যায় আসে না।

—খুব যায় আসে। ইন্দ্রাণী অনেকদিন পর খিল্‌খিল্ করে' হেসে উঠলো—একসঙ্গে তা'র হাতের উপর ঝুপ্ করে' অনেকগুলি যখন টাকা পড়ে তখন তা'র মেজাজে থাকে এমনি একটি স্বচ্ছন্দ লঘুতা: ডারউইনের থিওরির কন্‌ট্র্যারিটা তাই বলে' তুমি সপ্রমাণ করো না। যা লাগবে না-লাগবে কিনে-কেটে আনো গে—দশ টাকার বেশি এ-মাসে হাত খরচ পাবে না। নানান দিকে এবার আমার অনেক খরচ।

নোটটা টেব্‌লের উপর চাপা দিয়ে রেখে ইন্দ্রাণী ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো। প্রথমটা দর্শন তা'র চোখের সামনে দেয়ালটা যেন কেমন ঝাপ্‌সা দেখতে লাগলো, কিন্তু খরচ করুক বা না করুক, নোটটা সে হাওয়ায় উড়িয়ে দিতে পারলো না। এখন না হয় একটু, হ্যাঁ, একটু অপমান লাগছে, কিন্তু তা'র চেয়েও তীব্রতরো হ'বে অভাবের তাড়না, যখন হাতে থাকবে না সিগারেট কেন্‌বার পয়সা। দশ-দশটা টাকা, অভিমান করে' বাইরে অমন ফেলে রাখাটা নিরাপদ নয়। আস্‌চে মাসের পয়লা তারিখের আগে ইন্দ্রাণী যখন তা'র এ ঘরমুখো হচ্ছে না, তখন নোটটা টেব্‌লের উপর পড়ে' রইলো, না, দর্শনের মনি-ব্যাগের মধ্যে—তা'তে তো তার সমান দুশ্চিন্তা!

ই ন্দ্রা ণী

ইন্দ্রাণীর এ মাসে যে কী অনেক খরচ তা পরদিনই বোঝা গেলো।

স্কুল থেকে ফিরে এসে দর্শনকে সে জিগ্‌গেস করলে: কাল তুমি একটিবার ষ্টেশনে যেতে পারবে?

—কেন?

—Goodsএ একটা মাল এসেছে—সেটা ছাড়িয়ে নিয়ে আসবে।

—কী মাল? দর্শন সামান্য কৌতূহল প্রকাশ করলো।

—একটা ড্রেসিং-টেব্‌ল্।

—ড্রেসিং-টেব্‌ল্? দর্শন তো অবাক।

—হ্যাঁ, ড্রেসিং-টেব্‌ল্।

—ড্রেসিং-টেব্‌ল্ দিয়ে কী হ'বে?

—ড্রেসিং-টেব্‌ল্ দিয়ে যা হয়। ইন্দ্রাণী বিরক্ত মুখে বল্‌লে,—অতো কথা বলবার তোমার কী দরকার, দয়া করে' মালটা ছাড়িয়ে আন্‌তে পারবে কি না তাই বলো।

—কিন্তু, ঢোঁক গিলে দর্শন জিগ্‌গেস করলে: এইখেনে এই ড্রেসিং-টেব্‌লের মর্য্যাদা তোমার কে বুঝবে?

—পরকে দেখাবার জন্তেই মানুষ জিনিস কেনে নাকি? ইন্দ্রাণী ঠোঁট বাঁকালো।

—তা ছাড়া আবার কী! কথাটাকে দর্শন অবিশেষ, ব্যক্তি-বিরহিত করে' তুল্‌লো: মানুষের টাকা যতোক্ষণ ব্যাঙ্কে, ততোক্ষণ তা সে গোপন করে' রাখতে চায়, সেটা তা'র সযত্নসমৃদ্ধ আত্মম্ভরিতা; আর যখনই সেই টাকার মূল্যে কিছু সে কিনতে ও

অধিকার করতে চায়, তখন তা'র মাঝে যা সে ঘোষণা করে তা তা'র নিজের নির্লজ্জ দম্ভ ছাড়া আর কিছু নয়। অন্যের চোখ যাতে না টাটালো তেমন জিনিসের প্রতি সভ্য মানুষের লোভ নেই। পরকে যদি না সামান্য ঈর্ষান্বিত করে' তুল্‌তে পারি তবে বিলাসিতা করে' সুখ কী!

—থাক্, তোমার আমি এই ছেঁদো বক্তৃতা শুন্‌তে চাই না। ইন্দ্রাণী চোখ বড়ো করে' বল্‌লে,—আর কারুর জন্যে আমার মাথা-ব্যথা নেই, আমার অহঙ্কার তৃপ্ত হ'লেই আমি খুসি। যা পরের কাছে মাত্র বিলাসিতা, তা-ই হয়তো আমার কাছে পরম প্রয়োজন।

দর্শন গেলো মিইয়ে, মুখের স্নায়ুগুলি নিস্তেজ হ'য়ে এলো। দুর্ব্বল গলায় বল্‌লে,—কিন্তু কতো পড়লো ওটা তোমার আনতে শুনতে পাই?

—বেশি নয়। সবশুদ্ধু টাকা ষাটেক।

—ষাট টাকা! দর্শন না বলে' পারলো না: এই দুর্দ্দিনে তুমি এতোগুলি টাকা খরচ করে' ফেল্‌লে?

ইন্দ্রাণী জলের মতো তরল গলায় বল্‌লে,—অনায়াসে। একজনের সুদিন না হ'লে আরেকজনের দুর্দ্দিন হয় কি করে'? ও কথাটারো একটা মাত্র আপেক্ষিক অর্থ, ওতে কোনো সত্য নেই।

—কিন্তু এতো জিনিসের পাহাড় তুমি রাখবে কোথায়?

—কেন, এই বাড়িতেই। চাকরিতে যখন কনফার্মড্ হ'লাম, তখন এখেনেই তো শেকড় মেলে মৌরসি করে' বস্‌তে হ'বে।

—হুঁ! দর্শন তা'র বাঁ হাতের নোখগুলি তীক্ষ্ণ চোখে পর্য্যবেক্ষণ করতে-করতে বল্‌লে,—কিন্তু ঐ টাকায় কি আরো কোনো সদ্ব্যয় হ'তো না?

ইন্দ্রাণী শরীরে একটা অবিচল দৃঢ়তার ভঙ্গি এনে বল্‌লে,—প্রত্যেক টাকাতেই অপেক্ষাকৃত সদ্ব্যয় হ'বার সম্ভাবনা আছে। যে-টাকা দিয়ে তুমি একখানা কবিতার বই কিন্‌লে, সেই টাকায় হয়তো কোনো পরিবারের এক সপ্তাহের বাজার খরচ হয়। তাজমহল তৈরি করতে যে-টাকাটা অপব্যয় করা হ'লো তা দিয়ে তখনকার ভারতবর্ষের নাকি অনেক দুর্গতিমোচন হ'তে পারতো এমন অভিযোগও কেউ-কেউ করে শুনি। ইন্দ্রাণী হাসলো: সাজাহানের কাছে যা তাজমহল, আমার কাছে হয়তো তাই, একটা সামান্য ড্রেসিং-টেব্‌ল্।

দর্শন রুক্ষকণ্ঠে বল্‌লে,—কিন্তু তাজমহলের দিনে ভারতবর্ষের যদি ইতিহাস পড়ো, দেখতে পাবে সাজাহানের প্রজাদের মধ্যে এই রাক্ষসী দরিদ্রতা ছিলো না। তুমি তো অনায়াসে ষাটটা টাকা উড়িয়ে দিলে, কিন্তু কল্‌কাতায় মেজ-দার ছেলে দু'টির আজ সতেরো দিন ধরে' টাইফয়েড্—মেজ-বৌদি কেঁদে-ককিয়ে তোমাকে একটা চিঠি লিখলো পর্য্যন্ত—আর তুমি—

ইন্দ্রাণীর কথা তা'র মুখের উপর যেন ছিটকে পড়লো: চুপ করো। আমিও মহারাণীর মতো প্রজাপালন করছি। প্রজার দুঃখ দূর না করে' নিজের সমৃদ্ধি একা ভোগ করছি না।

দর্শন তা'র মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে' চেয়ে রইলো: কি, কী করেছ তুমি?

—বিশেষ কিছু অনিষ্ট করি নি। তোমার মেজ-বৌদির নামে পঁচিশটা টাকা মনি-অর্ডার করে' পাঠিয়ে দিয়েছি মাত্র, ছেলে দু'টিকে যেন ফল কিনে দেন, এটা-ওটা খরচের যাতে তাঁর একটু-আধটু সুবিধে হয়।

—কেন, কেন তুমি তাঁদের টাকা পাঠাতে গেলে? দর্শন চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠলো।

দর্শনের এই অস্বাভাবিক উত্তেজনায় ইন্দ্রাণী হঠাৎ ভেব্‌ড়ে গেলো। পাংশু মুখে, ম্লান গলায় সে জিগ্‌গেস করলে: কেন, কী অপরাধ হয়েছে?

—অপরাধ, একশো বার অপরাধ হয়েছে। দর্শন বিষে একেবারে ঝাঁজিয়ে উঠলো: তাঁদের এই অপমান করবার তোমার কী অধিকার ছিলো? তুমি তাঁদের কে যে দেমাক করে' তাঁদের টাকা পাঠাতে চাও?

ইন্দ্রাণী মুখ গম্ভীর করে' বল্‌লে,—কাউকে অপমান করতে কোনো অধিকারের কথা ওঠে না। আমার ইচ্ছা হয়েছে তাঁদের টাকা পাঠিয়েছি, আমার ইচ্ছা হয়েছে আমি ড্রেসিং-টেব্‌ল্ কিন্‌বো।

—তোমার ইচ্ছা নিয়ে তুমি থাকো, কিন্তু একজনকে বিপন্ন, অসহায় দেখে তা'র দুর্ব্বলতার সুযোগ পেয়ে তুমি তা'র মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করবে, এ কিছুতেই হ'তে পারে না। তুমি তা'দের কে, তোমার টাকা তা'রা কেন নিতে আসবে?

ইন্দ্রাণী বল্‌লে,—কেন, আমার টাকা কি তোমার টাকা নয়? তোমার থেকে নিতে পারলে, আমার থেকেই বা কেন নিতে পারবে না?

—কক্‌খনো নয়। তুমি আমাকে অপমান করতে হয় করো, কিন্তু, দর্শনের গলা প্রায় ধরে' এলো: আমাকে ঘিরে আমার সমস্ত পরিবারকে তুমি এইভাবে অপমান করতে পার্‌বে না। তুমি তাদের কেউ নও।

ইন্দ্রাণী ঝর্‌ঝর্‌ করে' হেসে ফেল্‌লো। বল্‌লে,—মেজ-দির ছেলে দুটির হ'য়ে আমার বল্‌তে ইচ্ছে করছে: 'হে পিতৃব্য, তব বাক্যে ইচ্ছি মরিবারে।' তোমার আমি কেউ না হ'তে পারি, কিন্তু আমি তা'দের কাকিমা, সম্পর্কে মেজ-দির ছোট বোন। তোমার মতো তা'দের সম্মানজ্ঞান অতো টন্‌টনে নয়। বলে' শরীরে একটা গতির ঝাপ্‌টা তুলে' ইন্দ্রাণী চলে' গেলো।

পর মুহূর্ত্তেই আবার সে এলো ভিতরে, বল্‌লে: এই দেখ মনি-অর্ডারের রসিদ। এই দেখ মা লিখেছেন পোস্‌ট্‌-কার্ড—চাকরি করে' নিয়মমতো মাস-মাস টাকা পাঠিয়ে তাঁর পর্য্যন্ত আশীর্ব্বাদ জোগাড় করে' ফেলেছি। টাকার কী মহিমা!

দর্শন বল্‌লে,—মা চিঠি লিখেছেন, কই, আমাকে বলো নি তো?

—টাকা পাঠিয়ে তাঁর পর্য্যন্ত আশীর্ব্বাদ পেয়ে গেছি, এ-খবর পেয়ে তুমি যদি মনে করো তাঁকে আমি অপমান করলাম?

—কবে চিঠি এলো?

—আজ। কী করবো বলো, আমার নামে বা কেয়ারে সব চিঠিই স্কুলের ঠিকানায় দিয়ে যায়, তাই চিঠিগুলি আমার হাতেই আগে পড়ে। নাও, পড়ে' দেখ চিঠিখানা।

মুখ ভার করে' দর্শন বল্‌লে,—তোমার চিঠি, আমি পড়তে যাবো কেন?

—বা, মা লিখেছেন যে। তোমার কথা আছে শেষের দিকে। এই যে—ইন্দ্রাণী পড়তে লাগলো: দর্শন কেমন আছে, কোনো কাজকর্ম্মের সুবিধা করিতে পারিল কি না জানাইয়ো।

দর্শন মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বল্‌লে,—থাক্।

ইন্দ্রাণী হেসে বল্‌লে,—আমি আজি জবাব দিয়ে দিলাম। লিখ্‌লাম: এইখানে আসিয়া উঁহার চমৎকার স্বাস্থ্য ফিরিয়াছে, কাজকর্ম্মের আর কোনো দরকার আছে বলিয়া মনে করেন না। ইন্দ্রাণী আবার শব্দ করে' হেসে উঠলো: তা তো হ'লো, কিন্তু ষ্টেশান থেকে আমার টেব্‌ল্‌টা কখন এনে দিচ্ছ।

সেল্‌ফ্ থেকে একটা বই পেড়ে তা'র পাতা উল্‌টোতে-উল্‌টোতে দর্শন বল্‌লে,—আমার দ্বারা কিছু হ'বে না।

—তা তো দেখতেই পাচ্ছি। একবারটি ষ্টেশানে গিয়ে খোঁজ নেবে, তা'তে তোমার পায়ে ফোস্কা পড়বে নাকি? এটুকু কাজও যদি না করে' দিতে পারো, তবে আছ কী করতে? ইন্দ্রাণী প্রায় মুখিয়ে উঠলো।

দর্শন একেবারে চুপ। অনবরত বইর পৃষ্ঠা ঘেঁটে কি সে খুঁজছে কে জানে।

ইন্দ্রাণী আরেক পশলা বিদ্রূপ বর্ষণ করলে: তোমাকে তো কাঁধে করে' আর বয়ে' আন্‌তে হ'বে না, না-হয় একটা গাড়ি ডাকিয়েই দিচ্ছি বাবুজিকে। মাগো, একটুও হাত-পা না নড়িয়ে

বিছানায় শুয়ে-শুয়ে লোকে যে কী করে' একটানা মোটা হ'তে পারে ভাবতেই পারি না।

দরজার কাছে এসে ইন্দ্রাণী আরেকবার পিছন ফিরলো: ভেবো না, তুমি না এনে দিলে জিনিসটা আমার মাঠে মারা যাবে। আমার টাকা, আমার জিনিস, আমিই আনিয়ে নিতে পারবো। বলে' গলা ছেড়ে সে চাকরের উদ্দেশে হাঁক দিলো: মদন! মদন!

কাপড়ে ভিজে হাত মুছতে-মুছতে চাকর এসে হাজির। ইন্দ্রাণী হুকুম করলে: যা তো এক্ষুনি, স্কুলের কেরানিবাবুকে গিয়ে বল্ আমি একবার তাঁকে ডাকছি। চিনিস তো তাঁর বাড়ি?

নিতান্ত আপ্যায়িত হ'বার ভঙ্গিতে ঘাড় হেলিয়ে চাকর প্রস্থান করলে। ইন্দ্রাণীও আর দাঁড়ালো না।

ঘরে আবার পুঞ্জীভূত হ'য়ে উঠলো আলস্যের মেঘ। দর্শন ইজিচেয়ারে ভেঙে পড়লো। পৃথিবীতে কি যে তা'র করবার আছে এমন কোনো কাজ সে আর খুঁজে পেলো না।

এখানে এসে অবধি মা'র সে একখানাও চিঠি পায় নি, অথচ বাড়ি ছেড়ে চলে' আসবার মুহূর্ত্তে যে-ইন্দ্রাণীকে তিনি মনে-মনে অভিশাপ দিয়েছিলেন তা'রই প্রতি এখন কিনা তাঁর মমতার সমুদ্র উথ্‌লে উঠেছে। তা'রই সঙ্গে তাঁর এখন যতো সম্পর্ক, যতো আত্মীয়তা। সত্যি, টাকায় কী না হয়, এমন যে মাতৃস্নেহ, তা-ও পর্য্যন্ত একটা পণ্য হ'য়ে ওঠে। প্রেম যায় টাকা দিয়েই কেনা, তা'কে রাখা যায় টাকা দিয়েই টিঁকিয়ে। তা'র

অতিরিক্ত কোনো মূল্য নেই—কথাটা কতো পুরোনো, কিন্তু এমন মর্ম্মান্তিক নতুন করে' দর্শন তা কোনোদিন বুঝবে বলে' বিশ্বাস করে নি। ইন্দ্রাণীর যে-টাকাটা সকলের চোখে নিতান্ত অশুচি, নিতান্ত অপরিচ্ছন্ন ছিলো, নিতান্ত টাকা বলে'ই তা'র আজ এতো সম্মান, এতো অভ্যর্থনা। সংসার দিব্যি দু' হাত পেতে তাই আজ অকাতরে গ্রহণ করছে। টাকাই টাকার মূল্য। তা'র কাছে সাজে না কোনো অভিমান, থাকে না কোনো রুচিবিরোধ। টাকাটা যে ইন্দ্রাণীর, তা'তে আজ আর কিছু এসে যায় না—টাকা টাকাই। টাকার জোরেই ইন্দ্রাণীর আজ এতো রূপ, এতো চরিত্রমর্য্যাদা; টাকা দিয়েই কিনে নিয়েছে সে সবার সঙ্গে সখ্য, অচ্ছেদ্য সোহার্দ্য: টাকা দিয়েই ফিরে পেয়েছে সে সংসারে নতুন জায়গা, সে-জায়গা সকলের হৃদয়ে। মনে করে' মাস-মাস ঠিকমতো টাকা পাঠায় বলে'ই সে আজ সবাইর কাছে 'এমন মেয়ে আর হ'তে নেই', 'যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী', 'কী চমৎকার কর্ত্তব্যবুদ্ধি'—আরো কতো কী এমনিধারা। বড়ো-বৌদির মেয়েদের কাছে যে-'ধিঙ্গি' ইন্দ্রাণী একদিন অসচ্চরিত্রতার মূর্ত্তিমতী দৃষ্টান্ত ছিলো, টাকার জোরেই হয়তো সে আজ তা'দের মায়ের ব্যাখ্যানুসারে একটা অনুকরণীয় আদর্শ হ'য়ে উঠেছে। টাকায় কী না অসাধ্যসাধন করা গেলো। অথচ এই কথা ভাবতেই দর্শন একেবারে কালিয়ে আসে, টাকার জোরে ইন্দ্রাণী সকলের আত্মীয় হ'য়ে উঠলো, শুধু সে-ই হ'য়ে গেলো পর, শুধু সে-ই রইলো দূরে। টাকা এলো আজ প্রেমের মূল্যনির্দ্ধার করতে।

ই ন্দ্রা ণী

শুধু দর্শনের কাছেই ইন্দ্রাণী আজ কুৎসিত, টাকায় কলঙ্কিত। তা'র রূপ আজ টাকার রজতলাবণ্যে, তা'র প্রেমের নিবিড় অনুভূতির আভায় নয়। টাকা দিয়ে সমস্ত বিরুদ্ধ সংসারকে সে বশ করেছে, সর্ব্বাঙ্গে তা'র উছ্‌লে পড়েছে এই অহঙ্কার। এমন-কি এই সোনার শৃঙ্খলে দর্শন পর্য্যন্ত বন্দী—চোখে তা'র সেই পাশবিক পরিতৃপ্তি। সকলের উপর সে জয়ী, ব্যবহারে তা'রই একটা উদ্ধত নিষ্ঠুরতা। টাকার আলোয় আবিষ্কার করেছে সে তা'র নিজের অর্থ, জীবন নিয়ে এই আবিল মত্ততা।

ইন্দ্রাণীকে কুৎসিত লাগে, কিন্তু বলতে গেলে, সে-ই তো তা'কে কুৎসিত করে' তুলেছে। দর্শনের সকল উত্তেজনা আবার জুড়িয়ে আসে। ইন্দ্রাণীর উপর রাগ করবার পর্য্যন্ত তা'র অধিকার নেই।

কয়েক দিন পর দর্শন ইন্দ্রাণীর কাছে এক আরজি নিয়ে হাজির হ'লো। চেয়ারে বসে' সামনের টেব্‌লের উপর ঝুঁকে' পড়ে' ইন্দ্রাণী তখন কতোগুলি পরীক্ষার কাগজ দেখছে।

দর্শন একটা সিগারেট টান্‌তে-টান্‌তে বার কয়েক নিঃশব্দে পাইচারি করলে।

টেব্‌লের থেকে মুখ না তুলে ইন্দ্রাণী জিগ্‌গেস করলে: কিছু বলবার আছে নাকি? কয়েকটা টাকা চাই? ক'টা?

দর্শন নীরক্ত, পাংশু মুখে বল্‌লে,—না। আমি চাকরি পেয়েছি।

ই ন্দ্রা ণী

—চাকরি পেয়েছ? একসঙ্গে ইন্দ্রাণীর সমস্ত স্নায়ু-শিরা যেন ঝঙ্কার দিয়ে উঠলো। খাতা-পত্র ফেলে-ছড়িয়ে রেখে সে একলাফে উঠে দাঁড়ালো: বলো কী? কোথায়?

দর্শন সাদা গলায় বল্‌লে,—এইখানে।

—এইখানে? ইন্দ্রাণী ভুরু কুঁচকোলো: এইখানে আবার কী চাকরি?

—হ্যাঁ, এইখানে একটা 'গণহিতৈষী' বলে' প্রেস আছে, সেই প্রেসে। দর্শন একমুখ ধোঁয়া ছাড়লো: হাফ-ম্যানেজারের কাজ।

—প্রেসে? ইন্দ্রাণীর মুখের প্রচ্ছন্ন রেখাগুলি যেন নিষ্প্রভ, দুর্ব্বল হ'য়ে এলো। সন্দিগ্ধ কণ্ঠে বল্‌লে,—কতো দেবে?

মুখে কোনো ভাব নেই এমনি নির্লিপ্ত গলায় দর্শন বল্‌লে,—বেশি নয়। টাকা ত্রিশেক।

—পাগল! নিদারুণ বিরক্তিতে ইন্দ্রাণীর মুখ কুটিল হ'য়ে উঠলো: একটা ফার্স্ট-ক্লাশ ফার্স্ট এম. এ. তিরিশ টাকার চাকরি করতে যাবে? ইন্দ্রাণী চেয়ারে বসে' পড়ে' ফের একজামিনের খাতায় মন দিলে: তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি সব লোপ পেয়ে গেলো নাকি?

—অনেক দিন। দর্শন এক পা এগিয়ে এসে বল্‌লে,—আমি তা'দের কথা দিয়েছি, পর্শু থেকে কাজে জয়েন করতে হ'বে।

—কথা দিয়েছ মানে? ইন্দ্রাণী দপ্‌ করে' জ্বলে' উঠলো: তুমি এতো সব পাশ করে' ঐ একটা নোংরা ইডিয়টিক কাজ নিতে যাবে তি-তিরিশ টাকার জন্যে?

—মন্দ কী! ফার্স্ট্-ক্লাশ ফার্স্ট্ হ'য়েই তো বসে' আছি, বরং দিনান্তে একটা করে' টাকা রোজগার হ'বে। এতোদিনে একটা কিছু তবু করলাম।

—কেন, কেন, তোমার কিসের আবার এতো টাকার দরকার পড়লো শুনি?

—বা, সংসারে কখনো টাকার অদরকার হয়?

—তাই ঐ রকম একটা ghoulish কাজ নিতে হ'বে—তিরিশ টাকার মাইনেতে? ঐ টাকায় তোমার কী এমন স্বর্গ মিলবে শুনি? ইন্দ্রাণী হঠাৎ তার টেব্‌লের টানা ধরে' এক টান মারলো: কতো টাকা তোমার চাই, তাই বলো না।

দর্শন বল্‌লে,—বারে-বারে তোমার কাছেই বা হাত পাতবো কেন? একটা টাকার ওপরে আমার তো একার কর্ত্তৃত্ব থাকতে পারে।

—ও! গলাটা একটু নামিয়ে চিবুকটা ভারি করে' ইন্দ্রাণী বল্‌লে,—আমার কাছে নিজের বলে' কিছু চাইতে বুঝি তোমার মানে ঘা লাগে? আর, ভাগ্যক্রমে তুমি রোজগার করলে তোমার কাছে টাকা চাইতে আমার তখন অপমান লাগতো না, না? স্বামীর কাছে স্ত্রীর টাকা চাওয়াটা আবদার, ভালোবাসা, আর স্ত্রীর কাছে চাইতে গেলেই সেটা পুরুষের অপমান, কেমন? কেন, কেন তুমি আমাদের মাঝে এই তফাৎ রাখবে?

দর্শন সিগারেটের পোড়া টুকরোটা জান্‌লার বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বল্‌লে,—কথাটা তুমি সেই দিক থেকে না দেখলেও পারো। তিরিশটা টাকা আয় বাড়ে, মন্দ কী।

—দরকার নেই তোমার আয় বাড়িয়ে। আমাদের এমন কিছু এখন অভাব নেই।

—কিন্তু, তা'দের যে আমি কথা দিয়েছি।

—কথা ফিরিয়ে নিতে কতোক্ষণ! খবরদার, তুমি ঐ চাকরি করতে পারবে না কিছুতেই।

দর্শন আম্‌তা-আম্‌তা করে' বল্‌লে,—কেন যে তোমার এতে আপত্তি হচ্ছে আমি কিছুতেই বুঝতে পাচ্ছি না।

—বুঝতে পারবেও না তুমি ইহকালে। ইন্দ্রাণী হেঁট হ'য়ে কাগজ দেখতে লাগ্‌লো: যাতে আমার সম্মান নষ্ট হয় এমন কোনো কাজ আমি তোমাকে করতে দিতে পারি না।

—তোমার সম্মান নষ্ট হয় মানে?

—নিশ্চয়। এখানে আমার একটা position আছে, সহরশুদ্ধু সবাই আমাকে এতো মান্য করে—আমার স্বামী হ'য়ে শেষকালে তুমি একটা প্রেসের কেরানিগিরি করবে ত্রিশ টাকা মাইনেয়—এ কিছুতেই হ'তে পারে না। আমার মুখ তখন থাকবে কোথায়, লোকে বলবে কী?

দর্শন একেবারে স্তম্ভিত হ'য়ে গেলো। তা'র আর কোনো নিজের পরিচয় নেই, সে ইন্দ্রাণীর মাত্র স্বামী। তা'র নিজের কোনো ব্যক্তিত্ব নেই, সে কী করবে না-করবে সব ইন্দ্রাণীর মুখ চেয়ে, ইন্দ্রাণীর মত নিয়ে, ইন্দ্রাণীর সম্মান বাঁচিয়ে।

দর্শন শুকনো একটা ঢোঁক গিলে বল্‌লে,—বা, honest labourএ তোমার আপত্তি হ'বে কেন?

ইন্দ্রাণী ঝাঁজিয়ে উঠলো: তুমি যদি খুব ভালো একটা চাকরি পাও, সংসার বেশ স্বচ্ছন্দে চলে' যায়, তখন ঐ honest labourএর অজুহাতে আমাকে তুমি ঝি-গিরি করতে দেবে? তোমার স্ত্রী honest labour করে' সংসারের আয়' বাড়াচ্ছেন দেখে তোমার মুখ বেয়ে তখন আহ্লাদের স্রোত গড়িয়ে পড়বে, না? যাও, ঐ চাকরিতে এক্ষুনি তুমি জবাব দিয়ে এসো।

দর্শন একটা সিগারেট ধরিয়ে আস্তে-আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। তা'র চেয়ে ইন্দ্রাণীর সম্মানের দাম আজ অনেক বেশি—টাকাই তা'কে আজ এই সম্মান এনে দিয়েছে।

পনেরো

গ্রীষ্মের ছুটি এসে পড়লো—প্রায় লম্বা দু' মাস। ইন্দ্রাণী এ-ছুটিতে কোথাও যাবে না, এইখানেই থাকবে, এইখানে তা'র অনেক কাজ। মেয়েদের দিয়ে এখানকার হাঁসপাতালের জন্যে কি-এক চ্যারিটি নাটক করবে তা'রই সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে সে মেতে আছে। বাঙলা ভাষায় মেয়েদের উপযুক্ত কোনো নাটক নেই, কাজেই তা'কে একটা লিখ্‌তে হচ্ছে মৌলিক, কা'কে কোন্ পার্ট দেয়া যেতে পারে সেদিকে নজর রেখে। ছুটি হ'য়ে গেলেও ইন্দ্রাণীর কাজের কামাই নেই: সকালে থিয়েটারের মহড়া, দুপুরে গানের ক্লাশ, বিকেলে আছে আবার তা'র 'যুগনারী'। কোথায় কী অস্পৃশ্যতা-দূরীকরণ নিয়ে সভা, সেখানেও ইন্দ্রাণী, কোথায় কী বিধবাবিবাহসহায়ক সমিতি, সেখানেও সে মাথা গলিয়েছে। কাজ, কাজ, কাজ—কাজ যেন তা'কে একটা নেশার মতো পেয়ে বসেছে। কাজ করবো ভাবলে পৃথিবীতে কাজের কখনো নাকি অভাব হয় না, ইন্দ্রাণীর হয়েছে তাই; কিন্তু দর্শনের পৃথিবী ঘুরছে উল্‌টো দিকে, কাজ বলে' আদৌ কিছু করবার আছে কি না, তা'তেই রয়েছে তা'র গভীর সন্দেহ।

ই ন্দ্রা ণী

ছুটির দিনেও ইন্দ্রাণীকে সে বিশ্রামে নরম, আলস্যে স্নিগ্ধ করে' দেখতে পেলো না, এখনো সে তলোয়ারের মতো ঝক্‌ঝক্ করছে উজ্জ্বল, এখনো সে নদীস্রোতের মতো ধারালো। নেই তা'তে একটু শ্রান্তির কোমলতা, নেই একটুখানি অবসাদের মাধুর্য্য। ইন্দ্রাণীকে দেখে আর মনে হয় না সে নিজেকে ও স্বামীকে ভরণ-পোষণ করবার জন্যেই চাকৃরি করতে এসেছে—এসেছে সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে বাইরের বাতাসকে তীব্রভাবে অনুভব করতে, তা'তে ব্যাপ্ত করে' দিতে তা'র বলিষ্ঠ অস্তিত্ব-চেতনা। চাকরিটা একটা তা'র প্রয়োজনীয় অনুষঙ্গ মাত্র, চাকরিই তা'র জীবনের শেষ কথা নয়। চাকরিটা তা'র জীবনের একটা ধাপ বলতে পারো, সেই তা'র সর্ব্বোচ্চ চূড়া নয়। বাঘ যেন পেয়েছে রক্তের স্বাদ, তেমনি নিশ্বাসে পেয়েছে সে পৃথিবীর গন্ধ, গায়ে লেগেছে তা'র সমুদ্রের হাওয়া। ভুল, ভুল, সে এসেছে দর্শনের অক্ষমতার ক্ষতিপূরণ করতে; সে এসেছে প্রতিষ্ঠিত করতে তা'র নিজের সুস্পষ্ট স্বেচ্ছাতন্ত্র, উড্ডীন করে' দিয়েছে সে তা'র উদ্ধত পতাকা। ইন্দ্রাণী তা'র স্বামীর জন্যে নয়, ইন্দ্রাণী তা'র নিজের জন্যে। কাউকে বাঁচাবার চাইতে নিজে বেঁচে ধন্য হ'বার তা'র সাধনা।

বিকেলে বেরুবার উদ্যোগ করতেই হঠাৎ পাশের ঘর থেকে কে যেন দর্শনকে ডেকে উঠলো: শুন্‌ছ?

এ যে ইন্দ্রাণী, দর্শন তা জানে, কিন্তু বিশ্বাস করতে তবু দেরি হচ্ছিলো, কেননা ইন্দ্রাণীর গলায় খেলেনি বহুদিন এমন একটি মিঠে সুর।

ইন্দ্রাণী

ইন্দ্রাণী তা'র চায়ের কাপে চুমুক দিতে-দিতে পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। মোলায়েম করে' বল্‌লে—তুমি বেরুচ্ছ নাকি? আজ আর বেরিয়ো না বাড়ি থেকে।

ধীরে-ধীরে স্নিগ্ধ একটি আবহাওয়া যেন ঘনিয়ে এলো। পিঠের উপর ইন্দ্রাণীর চুলগুলি ভিজা, উচ্ছৃঙ্খল, বুকের উপর আঁচলটা হাওয়ায় এলোমেলো। বৈকালিক গা ধুয়ে সে চা খাচ্ছে। প্রখর ও প্রচ্ছন্ন, সমস্ত গায়ে তা'র নির্ম্মল শীতলতা। চায়ের স্বাদে সিক্ত, আরক্তিম দু'টি ঠোঁটে কেমন একটা বিহ্বল লোলুপতা এসেছে। চোখের দৃষ্টিটি গাঢ়, মুখের ডৌলটি নরম, চিবুকটি কেমন লোভী। অনেক দিন ইন্দ্রাণীর সে এমন লাস্য দেখেনি, এমন গোপন প্রগল্‌ভতা।

দর্শন তা'র দিকে অফুরন্ত চোখে চেয়ে বল্‌লে,—কেন?

—আজ সন্ধ্যের সময় সাব্‌-ডেপুটিবাবুদের বাড়িতে আমাদের 'যুগনারী'র একটা মিটিং আছে, সেখানে আমার না গেলেই নয়। ফিরতে হয়তো একটু রাত হ'বে, তাই আজ না বেরুলে। ইন্দ্রাণী চোখে একটা হাসির ঢেউ তুললে: তোমার তো এখানে ক্লাবও নেই, আড্ডাও নেই—এতোদিন কড়িকাঠ ছাড়া আর কারু সঙ্গে তো ভাব করতে পারলে না। শুধু রাস্তা ধরে' একটু হেঁটে আসা—বার কয়েক উঠোনটায় চক্কর মারলেই তোমার সে-এক্‌সারসাইজ হ'য়ে যাবে।

আবহাওয়াটা উড়ে যাচ্ছিলো, ইন্দ্রাণী তাড়াতাড়ি তা'র মুখে আবার সেই অনুরাগের সুইচ্‌ টিপ্‌লে। লোভে সমস্ত মুখ উদ্ভাসিত করে' বল্‌লে,—বেরুতে আমার এখনো দেরি আছে,

চলো, আমরা ততোক্ষণ ঘাসের উপর গিয়ে একটু বসি। আরেক কাপ করে' চা করে' নিই—কেমন?

দর্শনের মুখ চুপ্‌সে এসেছিলো, আবার তা'তে রক্তের ছোঁয়াচ দেখা গেলো। ইন্দ্রাণী শরীরে লীলার একটা দক্ষিণ হাওয়া তুলে চলে' যেতে-যেতে বল্‌লে,—দাঁড়াও, জল বসিয়ে শাড়িটা ছেড়ে নিই চট্‌ করে'।

দু' বাটি চা সামনে নিয়ে দু'জনে ঘাসের উপর এসে বসেছে। বেড়া দিয়ে ঘেরা নিভৃত একটুকরো উঠোন, গা বেয়ে ঘন হ'য়ে উঠে গেছে কুঞ্জ আর অপরাজিতার লতা, আসন্ন অন্ধকারে নরম, নমিত, স্নেহার্দ্র আকাশ। এদিকটায় কেউ নেই, কেবল দু'জনের মাঝে গভীর অপরিচয়ের স্তব্ধতা। নিঃশব্দে চায়ের বাটিতে চুমুক দেয়া ছাড়া এ-সময়টাতে পৃথিবীতে আর যেন কিছু ঘটবার নেই। আশ্চর্য্য।

বাইরে বেরুবার পোষাকে ইন্দ্রাণী তারকাকীর্ণ আকাশের মতো ঝল্‌মল্‌ করছে। রাত্রির অন্ধকারের চেয়েও তা'র রহস্য আজ অগাধ—তা'কে ঘিরেছে আজ অজানার অন্ধকার। এই ইন্দ্রাণীই একদিন তা'র দেহে জেলেছিলো দীপ, চোখে এনেছিলো স্বপ্ন, এ-কথা যেন আজ বিশ্বাস করতেও ভয় করে। একদিন দর্শনের বাহুতে সে সঙ্কুচিত, ঝঙ্কৃত হ'তো,—এই ইন্দ্রাণী,—এ-কথা তা'কে মনে করিয়ে দিলেও যেন তা'কে অপমান করা হ'বে। আজ তা'র বাঁ হাতের কড়ে' আঙুলটি পর্য্যন্ত তা'র অচেনা। তা'র বসবার ভঙ্গিতে আর সেই আগেকার প্রশ্রয়শীল স্নেহের সুষমা নেই, রেখায় নেই সেই

তরঙ্গায়িত লীলা—তা'র বসবার ভঙ্গিটা পর্য্যন্ত এখন য়্যাসিষ্ট্যাণ্ট হেড্-মিস্ট্রেসের।

এ-রকম স্তব্ধ মুহূর্ত্ত আগেও তা'দের মাঝে এসেছিলো, কিন্তু তা'তে উচ্চারিত ছিলো স্পর্শপ্লাবিত মৌনভঙ্গের অসহ্য প্রতীক্ষা: স্তব্ধতা তখন গলে' পড়তো স্পর্শের প্রস্রবণে। কোনো কথা না বল্‌লেও ইন্দ্রাণী থাকতো সর্ব্বাঙ্গে বাঙ্ময়। সে-সব মুহূর্ত্ত যাযাবর পাখির মতো কবে বিদায় নিয়েছে, আজ সমস্ত আকাশে তা'দের চলে'-যাওয়ার স্তব্ধতা। এই নরম, ঘনিষ্ঠ আকাশের নিচে ইন্দ্রাণীকে আজ একটা গান গাইতে বলা পর্য্যন্ত সামান্য একটা ভদ্র ন্যাকামির মতো শোনাবে। যে গান গেয়ে তা'র পয়সা রোজগার হয় না, তা'র প্রতি আর যেন তা'র কোনো আকর্ষণ নেই।

ইন্দ্রাণী কেন যে তা'কে বাইরে বেরুতে বারণ করলো তা সে বুঝেছে—তা'র নিজের বেরুবার সুবিধে করবার জন্যে। তা'র সুবিধে করবার জন্যেই তো দর্শন এখানে রয়েছে। তবু তা'র কাছে একটা আবদার করবার অছিলায় ইন্দ্রাণীর শরীরে যে লাবণ্যের নদী জেগেছিলো তা'রই একটা ঢেউ হয়তো সে আশা করেছিলো তা'র দেহের তটে এসে আছড়ে পড়বে। তা'রি আশায় সে ছিলো স্তব্ধ, প্রতীক্ষাস্পন্দিত: কিন্তু নদীর উপর জেগেছে আজ চর, আর চঞ্চল লাবণ্য নয়, কতোগুলি মৃত, স্থূল মাংসস্তূপ।

দর্শন আস্তে-আস্তে চায়ের বাটিটা শেষ করলে। আরো খানিকক্ষণ চুপ করে' রইলো। ভাবলো কেন বা এই সন্ধ্যার আকাশ, এই ঘাসের উপর পা এলিয়ে বসা, ইন্দ্রাণীর এই বেশে-

বাসে আরণ্য সমারোহ। সন্ধ্যা, ইন্দ্রাণীকে এখন বাইরে বেরুতে হ'বে বলে'; সাজগোজ, সে 'যুগনারী'র প্রতিষ্ঠাত্রী'; ঘাসের উপর বসা, খানিকটা সেন্টিমেণ্ট্যাল আবহাওয়া তৈরি করে' দর্শনকে একটু ঠাণ্ডা করে' রাখা শুধু।

গলা খাঁখ্‌রে দর্শন বলে' উঠলো: তুমি তো এ-ছুটিতে কোথাও যাবে না?

চায়ের বাটিতে শেষ চুমুক দিয়ে ইন্দ্রাণী বল্‌লে,—কি করে' যাই বলো? কেবলই কাজের জালে জড়িয়ে পড়ছি। কোথায়ই বা যেতাম? গেলেই তো কতোগুলি খরচ। এই বেশ আছি, এই জায়গাটা আমার খুব ভালো লাগছে।

আঙুল দিয়ে মাটি খুঁড়তে-খুঁড়তে দর্শন বল্‌লে,—কিন্তু আমি কোথাও যেতে পারলে বাঁচতাম, ইন্দ্রাণী। কিছু টাকা আমাকে দাও না, কোথাও একটু ঘুরে আসি।

শিশুর মতো নিষ্পাপ দর্শনের মুখ, শিশুর মতো অসহায় তা'র কণ্ঠস্বরে ইন্দ্রাণীর মন হঠাৎ ব্যথায় মোচড় দিয়ে উঠলো। ধীরে একখানি হাত বাড়িয়ে, সরে' এসে দর্শনের ডান হাত কোলের কাছে টেনে এনে বল্‌লে,—কোথায় যেতে চাও?

—কল্‌কাতায়।

—সেখানে গিয়ে কী হ'বে?

—প্রাণপণ করে' দেখতাম কোথাও একটা চাকরি মেলে কি না।

ত্ব'ঠোঁটের প্রান্তটা একটু কুঁচ্‌কে ইন্দ্রাণী বল্‌লে,—আবার চাকরি!

ইন্দ্রাণী

—হ্যাঁ, এবার আমি ভয়ানক সিরিয়াস্। মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীরপাতন।

—ঐ শেষেরটাই সার হ'বে। তা'র হাতের পিঠের উপর আস্তে-আস্তে হাতের পিঠ বুলোতে-বুলোতে: কিন্তু কী তোমার জুটবে মনে করো?

—মনে করি তো অনেক কিছু, কিন্তু নিদেনপক্ষে একটা মাষ্টারি অন্তত জোগাড় করতে পারবো আশা করি। দর্শন ইন্দ্রাণীর হাতখানা ঘুরিয়ে মুঠোর মধ্যে চেপে ধরে' বল্‌লে,—আমি একটা ইস্কুল-টিচার হ'লে তো তখন আর তোমার সম্মানহানি হ'বে না। মাষ্টারের স্ত্রী মাষ্টারনি—কী বলো? অল্প একটু হেসে: ব্যাকরণ শুদ্ধ থাকবে।

ইন্দ্রাণী সামান্য ক্ষুব্ধ হ'য়ে বল্‌লে,—কিন্তু তোমার আবার চাকরি করার কী দরকার? এই তো দিব্যি আমাদের চলে' যাচ্ছে।

—চলে' যাচ্ছে না, ইন্দ্রাণী। একা-একা আমি ভীষণ ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছি, কিছু একটা না করতে পারলে আমি আর শান্তি পাচ্ছি না।

—বলো কী? তোমার চিরকালের শান্তি তো এই 'পীরিতি বালিশে আলিস ত্যজিব', তোমার আবার শ্রান্তি কিসের? কথাটা তরল করবার জন্যে ইন্দ্রাণী হেসে উঠলো। বল্‌লে,—একা-একা কেমন করে' হোল—এই আমি তোমার কাছে নেই? আমার থেকে দূরে সরে' গেলেই বুঝি তুমি ভরাট হ'য়ে উঠবে? বেশ আছ কিন্তু। আর আমি বেচারি তখন একা-একা থাকবো কি করে'?

সশব্দে একটা নিশ্বাস ফেলে দর্শন বল্‌লে,—আমি তোমার কাছে থাকি বা না থাকি, তোমার কী এসে যায়? আমাকে আর তোমার কী দরকার?

ইন্দ্রাণী মুখ ম্লান করে' খানিকক্ষণ দর্শনের মুখের দিকে চেয়ে রইলো। চোখ নামিয়ে গাঢ় গলায় বল্‌লে,—এই কথা তো তুমি বল্‌বেই। তোমার জন্যে আমি এতো করছি, এখন তোমাকে আর আমার কী দরকার? পুরুষরা এতো অকৃতজ্ঞও হয়! তোমার জন্যে না হ'লে আমি সাধ করে' এই চাকরি করতে এসেছি, না?

দর্শন ফের মাটি খুঁড়তে-খুঁড়তে বল্‌লে,—আমার জন্যেই হয়তো চাকরি করতে এসেছিলে, কিন্তু চাকরি করতে এসে তা'র কারণটা একেবারে তুমি তোমার দৃষ্টির বাইরে হারিয়ে ফেলেছ, ইন্দ্রাণী। আমি আছি কি নেই, এতে তোমার কিছু এসে যায় না। আগেও যেমন, এখনো তেমনি, চাকরি করাই তোমার প্যাশান্‌, নিজের বাঁচবার আনন্দের জন্যেই তোমাকে চিরদিন চাকরি করতে হ'বে।

—মা গো, কী সেন্টিমেণ্ট্যাল স্বামী নিয়ে আমাকে ঘর করতে হচ্ছে। ইন্দ্রাণী হাসতে-হাসতে উঠে পড়লো। বল্‌লে,—চাকরি করা কিনা আমার বাঁচবার আনন্দ! বেশি দিন এমন আনন্দ ভোগ করতে হ'লেই হয়েছে। তারপর হঠাৎ কাছে এসে নুয়ে পড়ে' দর্শনের কাঁধের উপর সে হাত রাখলে। বল্‌লে,—আমাদের থিয়েটারটা হ'য়ে যাক্‌, তখন একসঙ্গে দু'জনে কোথাও বেরিয়ে পড়বো না-হয়।

ঘাড়টা উঁচুয় তুলে ধরে' দর্শন বল্‌লে,—তারপর তোমার ছুটি ফুরুলেতেই আবার দু'জনে একসঙ্গে এখানে সোজা চলে' আস্‌বো ? এই তো ?

দর্শনের চুলগুলি দু'হাতে এলোমেলো করে' দিতে-দিতে ইন্দ্রাণী বল্‌লে,—উপায় কী তা ছাড়া ?

—না, একসঙ্গে নয়। আমাকে তুমি একবার একা ছেড়ে দাও, ইন্দ্রাণী।

ইন্দ্রাণীর হাত শিথিল হ'য়ে এলো; তবু মুখে হাসি এনে বল্‌লে,—একা ছেড়ে দেবার জন্যে মশাইকে এতো হাঙ্গাম-হুজ্জৎ করে' বিয়ে করা হয় নি। জোয়ান পুরুষ মানুষ—একাকীত্বকে ভয় করো না, কিন্তু জোয়ান মেয়েছেলের অনেক ল্যাঠা। ঐ বুঝি গাড়ি এলো আমাকে নিতে। অসীম উৎসাহে ইন্দ্রাণী হঠাৎ নুয়ে পড়ে' দু' হাতে দর্শনের গলা জড়িয়ে ধরলো: আমি তোমায় ফেলে কোথাও এক পা গেছি যে তুমি আমায় ফেলে চলে' যেতে চাও একা? ভালোবাসার দায়িত্ব কেবল আমার, তোমার নেই এককণাও, না? তোমাকেই আমার অনুগমন করতে হ'বে, আর আমাকে তোমার একটুও অনুসন্ধান করতে হ'বে না? আমি তোমার স্ত্রী হয়েছি বলে' কি তোমার কাছেও এতো ছোট হ'য়ে গেছি?

পরে আরো সে নিচু হ'লো, তা'র কথার তাপ লাগতে লাগলো দর্শনের মুখে। কানে-কানে বলার মতো করে' ইন্দ্রাণী বল্‌লে,—কোথাও তোমার যেতে হ'বে না, এইখেনেই তুমি থাকো, আমার আঁচলের তলায়, বুঝলে? শোনো, ফিরতে আমার রাত

হ'তে পারে, আমার জন্যে খেতে দেরি কোরো না যেন। মদন! মদন!

মদন এসে দাঁড়ালো।

—আমার সঙ্গে যাবি চল্ গাড়ির পেছনে চড়ে'। ও মা, সাব-ডেপুটি-গিন্নিই যে স্বয়ং এসে গেছেন। চল্লাম। বলে' শরীরে যেন পাখির মতো হাল্কা পাখা মেলে ইন্দ্রাণী বাতাসে গেলো উড়ে।

বহুদিন পরে একটি মুহূর্ত্ত এসেছিলো ভেসে, ইন্দ্রাণীর চলে'-যাওয়ার শূন্যতায় বাজছে যেন অন্তরঙ্গতার সুর। দর্শনের সমস্ত স্নায়ু-শিরা নেশায় বিভোর হ'য়ে উঠলো। চোখে নামলো তন্দ্রার কুয়াসা। তা'র মেরুদণ্ডের ঋজুতা আলস্যের সুখাবেশে আবার এলো স্তিমিত হ'য়ে।

রাত তখন অনেক, একঘুম থেকে জেগে উঠে দর্শন দেখলো বাইরে রাশি-রাশি জ্যোৎস্না ফুটেছে। শুক্লপক্ষের চাঁদ যে পুরন্ত হ'তে-হ'তে আজকের রাতেই এতো প্রগল্ভ হ'য়ে উঠেছে তা সে এতোক্ষণ টের পায় নি। দর্শনের মনে হ'লো যেন কা'র গান নিঃশব্দতায় তুষারীভূত হ'য়ে উঠেছে, সে-নিঃশব্দতা যেন তারো মনে, ঝরে' পড়েছে তা'র বিছানায়, ঘরময় ফিকে, নীল্চে অন্ধকারে।

দর্শনের কী যে মন-কেমন করে' উঠলো বলা কঠিন। আজ সন্ধ্যায় ইন্দ্রাণী হঠাৎ তা'র কাছে এসে পড়েছিলো—হয়তো তা'রি জন্যে: ভালোবাসার দায়িত্ব শুধু ইন্দ্রাণীর একার নয়—হয়তো তা'রি জন্যে: তা'কে এখানে একা ফেলে কিছুতেই সে যেতে

দেবে না—হয়তো তা'রি জন্যে একঘুমের পর জ্যোৎস্না এতো সুন্দর লাগছে, রক্তে ধরেছে স্বপ্নের শিখা, স্নায়ুতে-শিরায় বাজছে এই নিশীথরাত্রির মৌনঝঙ্কার।

ভিতরের দরজাটা খোলাই থাকে বরাবর, দরজাটা আস্তে ঠেলে পা টিপে-টিপে দর্শন ইন্দ্রাণীর ঘরে ঢুকে পড়লো। ইন্দ্রাণী কখন যে ফিরেছে দর্শন টের পায় নি, ঠাকুর-চাকরকে জাগা রেখে সে ঘুমিয়ে পড়েছিলো। ফিরতে যে তা'র অনেক রাত হয়েছে, বেশিক্ষণ যে সে ঘুমোয়ানি, তা'র শোয়ার এই বিস্রস্তি-হীনতা থেকেই তা দর্শন আন্দাজ করতে পারলো। ওখান থেকেই হয়তো খেয়ে এসেছে, ঘরের ভিতর পিতলের টোপে ভাত ঢাকা। গা ভরে' এতো তা'র ঘুম পেয়েছিলো যে ব্লাউজটা খুলে ফেললেও শাড়িটা সে বদলাতে পারে নি, মশারিটাও টাঙায়নি পর্য্যন্ত। বিছানায় শুতে-না-শুতেই গেছে ঘুমের গভীর কোলে ডুবে।

ফুলের মতো কোমল অন্ধকারে দর্শন বুক ভরে' ইন্দ্রাণীর এই ঘুমের ঘ্রাণ নিতে লাগলো। ঘুমে ইন্দ্রাণীকে কী যে করুণ, কী যে অসহায় লাগছে। পা দু'টি দুর্ব্বল রেখায় এসেছে বেঁকে, মুখের ঘুমন্ত ডৌলটিতে যেন একটি নির্ম্মল বিষণ্ণতা। দর্শন কী যে করবে, নাম ধরে' ডাকবে, না, তা'র পাশে বসে' পড়ে' নীরব, গভীর স্পর্শে তা'র ঘুম ভাঙাবে, কিছু ঠিক করতে পারলো না। দিনের আলোয় সেই উদ্ধত বিজয়িনীকে রাত্রির এই একাকী অন্ধকারে কেমন অবনমিত, পরাভূত দেখাচ্ছে। তা'র জন্যে দর্শনের মায়া করতে লাগলো।

তবু সে করতে লাগলো দ্বিধা। কাছে এসে তা'র নাম ধরে' ডাকবে, না, তা'কে ছুঁয়ে জ্যোৎস্নাঞ্চিত করে' তুলবে, তাই তা'র কাছে একটা সমস্যা হ'য়ে উঠলো। করতে লাগলো 'তা'র ভয়, যুক্তি দিয়ে বসলো সে সেই ভয় খণ্ডন করতে। করতে লাগলো বা তা'র লজ্জা, কিন্তু প্রতীক্ষায় ক্লান্ত হ'য়ে সে যদি তা'র স্ত্রীর কাছে সান্ত্বনার জন্যে এসেই থাকে, তবে লজ্জা কিসের! অলক্ষিতে দর্শন দু' পা এগিয়ে এলো।

ঘুমের মধ্যে ইন্দ্রাণী টের পেয়েছে কা'র উপস্থিতির ঘনতা। তা'র ঘুমের জ্যোৎস্নায় পড়েছে যেন কোন কালো ছায়া। চোখ মেলেই সে হঠাৎ যেন ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠলো: কে? কে ওখানে?

আর্ত্তনাদ শুনে দর্শন একমুহূর্ত্তে যেন একটা নিষ্কম্প পাথর হ'য়ে গেলো। আওয়াজ করতে গেলো, গলাটা কাঠ হ'য়ে গেছে। ভাবলে খোলা দরজা দিয়ে ছুটে পালিয়ে যায়, কিন্তু পায়ে নেই এতোটুকু আর জোর।

আধো ঘুমে, স্বপ্নে যেন একটা অতিকায় মূর্ত্তি দেখছে এমনি আতঙ্কে ইন্দ্রাণী আবার চীৎকার করে' উঠলো: কে, কথা কয় না কেন? পরে পাশের ঘরের দেয়াল লক্ষ্য করে'ই হয়তো সে অন্ধকারে ডাকতে লাগলো: ওগো শুন্‌ছ, শিগ্‌গির, শিগ্‌গির চলে' এসো—

যেন চুরি করতে এসেছে এমনি অপরাধীর মতো ম্লান কণ্ঠে দর্শন বল্‌লে,—আমি। ভয় নেই।

—তুমি? এতোক্ষণে ইন্দ্রাণী চিন্‌তে পেরেছে। চোখ দু'টো কচ্‌লে নিয়ে সে বিছানার উপর উঠে বস্‌লো। বিরক্ত,

রুক্ষ গলায় বল্‌লে,—তুমি এতো রাতে এই ঘরে কী করতে এসেছ ?

দর্শন প্রকাণ্ড একটা ঢোক গিলে বল্‌লে,—দেয়াশলাই একটা খুঁজতে এসেছিলাম।

—এই নাও। বালিশের তলা থেকে ম্যাচ-বাক্সটা দর্শনের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে ইন্দ্রাণী আবার বালিশে ভেঙে পড়লো। হাঁটুর দিকের কাপড়টা ঠিক করতে-করতে বল্‌লে,—বাবাঃ, কী ভয় যে পেয়েছিলাম। ভাবলাম কে-না-জানি কে। মানুষে একবার ডাকে, তা না, ভূতের মতো অন্ধকারে চুপ করে' ঠায় দাঁড়িয়ে আছে।

দেয়াশলাইটা দর্শনকে কুড়িয়ে নিতে হ'লো অবিশ্যি।

শরীরটাকে ফের শিথিল করে' এনে ইন্দ্রাণী প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গের স্বরে বল্‌লে,—এতো রাতে আবার তোমার আলোর দরকার পড়লো কিসের ? যাও, চুপ করে' এখন ঘুমিয়ে থাকো গে। রাত জেগে আর বই পড়তে হ'বে না।

আসবার সময় অন্ধকারে ঠিক সে আসতে পেরেছিলো, ফিরে যাবার সময় দেয়াশলাইর কাঠি জ্বেলে দর্শনকে পথ চিন্‌তে হ'লো। অথচ, কল্পিত আততায়ীর বিরুদ্ধে সেই ছিলো কিনা ইন্দ্রাণীর রক্ষক। ছি ছি ছি, এর আগে দর্শনের মরে' যেতে কী হয়েছিলো ?

দর্শন বাকি রাত আর ঘুমুতে পারলো না। বিছানায় যেন কাঁটা ফুট্‌ছে : দেওয়ালগুলো নীরবে দাঁড়িয়ে কর্‌ছে অট্টহাস্য। বারান্দায় চেয়ার টেনে এনে তন্দ্রাহত, ক্লান্ত চোখে সে জ্যোৎস্নাময়

রাত্রির শূন্যতার দিকে চেয়ে রইলো। দর্শনের ফেনিল ভালোবাসার মতো আকাশে উথলে উঠেছে জ্যোৎস্না, অথচ সমুদ্রে নেই প্রতিধ্বনি। পথ চিনতে দিয়াশলাইর কাঠি জ্বেলে সেই যে ক্ষণিক আলো করেছিলো তা'র শিখার তীক্ষ্ণ রেখাটা বুকের মধ্যে তা'র ছুরি চালাচ্ছে।

নিশ্চয়, দর্শন তা'র কে—তা'র চেয়ে বড়ো ইন্দ্রাণীর 'কেরিয়ার', তা'র এই নির্বাধ উদ্দামতা, এই তা'র বিশাল পক্ষবিস্তার। দর্শন তো তা'র স্রোতের মুখে একটা বাধা, তা'র অস্তিত্বটা তা'র পক্ষে বিরাট একটা অত্যাচার ছাড়া আর কিছু নয়।

ষোলো

ফার্স্ট্-ইয়ারে পড়তে গরমের ছুটিতে দর্শন একবার জঙ্গিপুর গিয়েছিলো মনে আছে, তা'র দূর-সম্পর্কের এক দিদির বাড়িতে। সেখানে, কর্ণপরম্পরায় শুনতে পেয়েছিলো, এক ভদ্রলোক আজ প্রায় মাস দুয়েক ধ'রে' সমানে শ্বশুরবাড়িতে অধিষ্ঠান করছেন। ভদ্রলোকটির চাকরি-বাকরির সুবিধে হচ্ছিলো না, তাই কয়েকটা দিন শ্বশুরবাড়ি এসেছিলেন হাওয়া বদ্‌লাতে। দিনের পর দিন ক্রমশই যেন তাঁর এই বোধোদয় হচ্ছিল যে এই রকম হাওয়া খেতে পেলে চাকরি করবার আর দরকার নেই। মনে আছে, পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে দর্শনও তাঁর পেছনে ফেউ লেগেছিলো, তাঁকে শুনিয়ে-শুনিয়ে সেও কাটতো ছড়া, কথা কইতো চিম্‌টি কেটে। জামাইবাবু হয়তো বিকেলে হাওয়া খেতে বেরিয়েছেন, রাস্তার ধারে গুল্‌তানি করছিলো একদল ছেলে—তা'দের ভিতর থেকে একজন হয়তো বলে' উঠলো : 'বাইরের জামাই মধুসূদন, ঘরের জামাই মেধো ; ভাত খাওসে মধুসূদন, ভাত খেসেরে মেধো।' কেউ হয়তো হবিবিনা হরির্যাতি আওড়ে দিলে : কেউ বা বল্‌লে : লক্ষ্মীছাড়ার ভক্তি বেশি। একজন একেবারে

সুর করে' গান ধরে' উঠলো : 'যা ছিলো আমানি-পান্তা মায়ে-ঝিয়ে খেলুম ; ঘর-জামাই রামের তরে ধান শুকোতে দিলুম।' মনে আছে, ভদ্রলোক কোনোদিকে না চেয়ে নিঃশব্দে হেঁটে যেতেন, আর তা'রা হাসির হিল্লোড়ে খান-খান হ'য়ে যেতো। সে ক'টা দিন তা'র কী মজাতেই যে কেটেছিলো।

দর্শন পোষ্টাপিসে যাচ্ছিলো চিঠির উইণ্ডো-ডেলিভারি আনতে। চিঠি ইন্দ্রাণীর হোক বা ইন্দ্রাণীর কেয়ারে তা'র নামেই আসুক, স্কুলে আর বিলি হয় না, পিওন সটান বাড়িতেই দিয়ে যায়—দর্শনের, অর্থাৎ ইন্দ্রাণীর স্বামীর হুকুমে। ইচ্ছে করলে মাঝে-মাঝে সে পোষ্টাপিসে এসেও বিটের পিওন থেকে ডেলিভারি নিয়ে যায় কোনো দরখাস্তের জরুরি জবাব পাবার সম্ভাবনা থাকলে। তেমনি সে আজ যাচ্ছিলো।

পোষ্টাপিসের সামনে রাস্তার পাশে একদল অল্পবয়সী যুবক জাঁকিয়ে আড্ডা দিচ্ছে। মফঃস্বলে নতুন লোক, কারুর মুখও সে দু'বার করে' দেখেনি, দর্শন তা'দের উপেক্ষা করে'ই চলে' যাচ্ছিলো, হঠাৎ তা'র কানে এলো কে-একজন বলছে : বাবু-বেয়ারা ঐ চল্‌লেন চিঠি আনতে।

এদের মাঝে একজন হয়তো আনাড়ি ছিলো, জিগগেস করলে,—কে, কে ভাই ?

চাকে যেন ঢিল পড়লো, মৌমাছিরা ঝাঁক বেঁধে বেরিয়ে এলো শতমুখে হুল ফোটাতে। পায়ের ধাপগুলি দর্শন মন্থর করে' আন্‌লে।

—চিনিস্ না ওকে? এখানে যে নতুন মিস্ট্রেস্ এসেছে—ও হচ্ছে তা'র অনারারি বাবু-বেয়ারা। বৌর মাথায় ধরে ছাতি, পরিয়ে দেয় জুতোর ফিতে। বৌ আছে মাষ্টারি করতে, ও করে বাড়ির দরোয়ানি, উনুন ধরায়, গোবর শুকিয়ে ঘুঁটে দেয়। বিনে-মাইনের পোষাকি চাকর, ওকে চিনিস্ না?

অনভিজ্ঞ ছেলেটির তখনো ধাঁধা লাগছে। বল্লে: নতুন মিস্ট্রেসের স্বামী নাকি?

—হ্যাঁ রে, নতুন মিস্ট্রেসের ল্যাপ-ডগ্। প্রাণিজগতের একটা প্যারাসাইট্। বেচারি বউকে দিয়ে খাটিয়ে নিজে পয়সা লুটছে। **Immoral Traffic Act**এর মতো একটা **Marriage Traffic Act** পাশ্ করা উচিত—কী বলিস রে শচীন? যা না কুট্টি, ওকে গিয়ে একবার জিগ্গেস কর্ না: কেমন আছেন, মিসেস চ্যাটার্জি?

—মিসেস চ্যাটার্জি কেন?

—বা, **originally** ওর স্ত্রী যে চ্যাটার্জি ছিলেন, ওর সঙ্গে তাঁর সিভিল্ ম্যারেজ হয়েছে। আসলে ওর স্ত্রীই যখন কর্ত্রী, তখন ওরই তো উচিত ওর স্ত্রীর পদবী নেয়া। মিষ্টার না বলে' ওকে মিসেস্ চ্যাটার্জি বল্লেই ও খুসি হ'বে।

দর্শনকে লক্ষ্য করে' কুট্টি-নামীয় ছেলেটি, যাকে বলে খেঁকিয়ে উঠলো: এক পয়সা কামাবার নেই মুরোদ, তায় ছিবিল্ ম্যারেজ! তেলের ভাঁড়ে তেল নেই, তায় পলায় মারে ঘা। মরে' যাই, মরে' যাই।

ইন্দ্রাণী

কথাগুলি অসংলগ্ন হ'য়ে দর্শনের কানে আসছিলো। পোষ্টাপিসে আর না দাঁড়িয়ে রাস্তা ধরে' সে সোজা বেরিয়ে গেলো।

কথাগুলি শুনে ভীষণ রাগ হচ্ছিলো তা'র, কিন্তু এই সব সিভ্যাল্‌রাস্‌ ছেলে-ছোকরার দুর্বিনীত গ্রাম্যতার জন্যে নয়, রাগ হচ্ছিলো তা'র নিজের উপর, তা'র এই নির্লজ্জ অকর্ম্মণ্যতার বিরুদ্ধে। অকর্ম্মণ্য তো বটেই, এমন-কি সে একটা অপাঙক্তেয় অপুরুষ। বিরাট একটা গাছের ছায়ায় লালিত, পরাশ্রিত একটা আগাছা। সব সময়ে ভঙ্গিটা তা'র ভিক্ষার অনুনয়ে শিথিল, নির্ভর করে' দাঁড়াতে-দাঁড়াতে তা'র মেরুদণ্ড গেছে বেঁকে। এখান থেকে চলে' যাবে, তাইতেও চাই ইন্দ্রাণীর অনুমতি; রাত্রে স্ত্রীর ঘরে ঢুকে পড়েছে, তাইতেও চাই তা'র একটা সম্মানজনক জবাবদিহি। কোনো কাজ যেন তা'র নিজে থেকে করবার নেই যা একবার না উপর থেকে মঞ্জুর হ'য়ে এসেছে। সে যেন ইন্দ্রাণীর হাতে একটা টিনের পুতুল, খানিকটা দম দিয়ে দিলে সে একটু তড়পাবে, নইলে আমরণ আছে সে তা'র মুখের দিকে চেয়ে।

সে আর ইন্দ্রাণীর পূর্ব্বরাগ-পরিচ্ছেদের প্রেমিক নয় যে স্বপ্নের জালে জড়িয়ে থেকে বসে'-বসে' প্রতীক্ষা করবে, সে তা'র স্বামী, প্রতিষ্ঠিত করবে সে তা'র প্রভূততরো ব্যক্তিত্ব, বিস্তৃততরো শাসন। তা'র ছন্দের অনুবর্ত্তিনী হ'বে ইন্দ্রাণী, হ'বে তা'রই কামনার প্রতিরূপা। সে স্বামী হ'য়ে স্ত্রীর কাছ থেকে প্রেমের নামে নেবে না এই পরাভব, একীভূততার নামে মানবে না এই

নিশ্চিহ্নতা। রাত্রিতে তা'র স্ত্রীর ঘরে যদি সে গিয়েই থাকে, তবে তা'তে নেই তা'র স্বামিত্বের অগৌরব, সে প্রতিষ্ঠিত করবে তা'র নিজের অধিকার; যদি সে এখান থেকে কোথাও চলে' যেতে চায়, তা'র ইচ্ছাই সেখানে যথেষ্ট, তা'র স্বার্থের দাবিই হচ্ছে প্রথমতরো। ইন্দ্রাণীকে সে ভালোবাসলেও স্বামীরই মতন ভালোবাসে।

ইন্দ্রাণীর ঘরে সেই তা'র ধরা পড়ে' যাওয়ার দিন থেকে দর্শনকে ইন্দ্রাণী যেন কেমন একটু ঘৃণামিশ্রিত করুণার চোখে দেখছে। তা'র সেই প্রণয়োচ্ছ্বাস যে তা'র অকর্ম্মণ্যতারই একটা কুৎসিত বিকার এই ধারণাই যেন ব্যক্ত হ'য়ে উঠছিলো ইন্দ্রাণীর ব্যবহারে। তা'তে, দর্শন যে তা'র স্বামী, এই স্থূল সত্য কথাটাও যেন সে এড়িয়ে যেতে চাইছে। তা'র স্বামীর চেয়ে বড়ো তা'র এই আবিল স্বার্থপরতা, এই তা'র উদ্দাম, উড্ডীন পক্ষবিক্ষেপ—এই লাঞ্ছনা দর্শনের কাছে অসহ্য লাগছিলো। প্রেমের প্রতি দর্শনের আর মোহ নেই, কিন্তু তা'র স্বামিত্বকে অপমান! ইন্দ্রাণী আজকাল দরজায় খিল চাপিয়ে শোয়, স্বামী হ'লেও তা'কে সে একটা আততায়ীর মতো অবিশ্বাস করে। প্রেম থাক্ অনুচ্চারিত, কিন্তু এই তা'র জাজ্জ্বল্যমান স্বামিত্ব ইন্দ্রাণীকে কিছুতেই প্রতি পদে তেমন করে' সে অস্বীকার করতে দেবে না।

রবিবার বিকেলে বারান্দায় ইজিচেয়ার টেনে দর্শন বসে' একটা বই পড়ছিলো, ইন্দ্রাণী হয়তো তা'র ঘরে বৈকালিক বেশভূষা করছে, এমন সময় সুবেশ একটি ভদ্রলোক বাড়ির

গেইট খুলে ভিতরে এসে দর্শনকে জিগ্‌গেস করলে: ইন্দ্রাণী দেবী আছেন?

তেরছা চোখে তা'র দিকে চেয়ে দর্শন রুক্ষ গলায় বল্‌লে,—কেন, কী দরকার?

ভদ্রলোক অসহিষ্ণু হ'য়ে বল্‌লে,—থাকেন তো kindly একবারটি ডেকে দিন।

—কেন, কী দরকার বলুন।

লোকটার গায়ে-পড়া কর্ত্তৃত্ব দেখে ভদ্রলোক একটু গরম হ'য়ে উঠলো। বল্‌লে,—তিনি এলে তাঁকেই বলা যাবে। তিনি আছেন?

—আছেন। দর্শন গ্যাঁট্‌ হ'য়ে চেয়ারের উপর পা তুলে উঠে বসলো: কিন্তু আমাকে আগে বলুন কী দরকার। আমাকে না বল্‌লে তাঁর দেখা পাচ্ছেন না। আপনার নাম কী?

ভদ্রলোক বল্‌লে,—আমার নামে আপনার দরকার নেই। আমাদের ও-পাড়ায় অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে একটা মিটিং হচ্ছে আজ, তা'তে ইন্দ্রাণী দেবী একটা পেপার পড়বেন বলে' কথা আছে। তাঁকে নিয়ে যেতে আমি গাড়ি নিয়ে এসেছি। তাঁকে একবারটি দয়া করে' ডেকে দিন্।

দর্শন কটুকণ্ঠে বল্‌লে,—গাড়ি নিয়ে আপনি স্বচ্ছন্দে ফিরে যেতে পারেন। ইন্দ্রাণী দেবী যাবেন না মিটিংয়ে।

—সে কী কথা? ভদ্রলোকের মুখ ফ্যাকাসে হ'য়ে গেলো: সব ঠিকঠাক, সাত দিন আগে থাকতে announce করে' দেয়া হয়েছে। কাল বিকেলে পর্য্যন্ত আমাদের লোক ইস্কুলে গিয়ে

জেনে এসেছে তাঁর পেপার রেডি—তিনি আজ সাড়ে-ছ'টায় গাড়ি পাঠিয়ে দিতে বলেছেন।

দর্শন বইর দিকে চেয়ে পরম উদাসীনের মতো বল্‌লে,—যা খুসি তিনি বলতে পারেন, কিন্তু আমি বলছি যাওয়া তাঁর হ'তে পারে না। দাঁড়িয়ে আছেন কী? মিটিং করুন গে যান্‌।

ভদ্রলোক বল্‌লে,—আপনার কথায় যেতে পাচ্ছি না। তাঁকে একবার ডেকে দিন্‌, আমাদের **difficulty**-টা **explain** করলে নিশ্চয়ই তিনি যেতে রাজি হ'বেন। সব ঠিকঠাক, অনেকে এসে গেছে—

—এ তাঁর রাজি-অরাজির কথা নয়। এ আমার মত। দর্শন চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো ; দৃঢ়কণ্ঠে বল্‌লে,—আমি তাঁর স্বামী আমি চাই না যে তিনি কোনো পাব্‌লিক্‌ মিটিংয়ে বক্তৃতা দেন।

দর্শনের কথা শুনে ভদ্রলোকের মুখের চেহারা এক নিমেষে বদ্‌লে গেলো, রুক্ষতা এলো অতিবিনয়ে স্নিগ্ধ হ'য়ে। দু' হাত জোড় করে' আর্দ্র কণ্ঠে সে বল্‌লে,—নমস্কার। আমি আপনাকে চিন্‌তাম না, মার্জ্জনা করবেন। আমাকে তাঁরা গাড়ি দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন যে করে' হোক ইন্দ্রাণী দেবীকে নিয়ে যেতে। তা, কী বলবো গিয়ে তাঁদের আমি? ইন্দ্রাণী দেবী অসুস্থ, তিনি আসতে চাইলেন না?

—না, তিনি অসুস্থ নন। গিয়ে বল্‌বেন, তাঁর স্বামী তাঁকে যেতে দিলো না।

—কিন্তু পেপারটা যদি পাওয়া যেতো, আর কেউ আমরা তাঁর হ'য়ে পড়ে' দিতাম।

—না, তা-ও সম্ভব নয়।

—আচ্ছা, তবে আসি। বলে' ভদ্রলোক দর্শনকে আরেকটা বিনীত নমস্কার করে' রাস্তায় গাড়ি নিয়ে অদৃশ্য হ'য়ে গেলো।

অপরিচিত ভদ্রলোক পর্য্যন্ত তা'র এই স্বামিত্বকে যথোপযুক্ত মর্য্যাদা দিয়ে গেলো, কিন্তু গাড়িটা মোড় ঘুরতেই ইন্দ্রাণী, বহির্বেশসজ্জিতা বাগ্মী ইন্দ্রাণী, হুড়মুড় করে' বারান্দায় ঢুকে পড়লো; প্রখরকণ্ঠে বল্‌লে,—আমাকে তুমি যেতে দেবে না মানে?

করুণ করে' ঢের দর্শন কথা কয়েছে, হাঁটুর উপর ভেঙে পড়ে' করেছে সে অনেক বিনতি, ভিক্ষা চেয়ে-চেয়ে আত্মদৌর্ব্বল্যকে দিয়েছে সে অনেক প্রশ্রয়; আজ সে পুরুষ, অনিবার্য্যরূপে আজ সে ইন্দ্রাণীর স্বামী। দর্শন চেয়ারে বসে' গম্ভীর হ'য়ে বল্‌লে,—যেতে দেবো না, আমার ইচ্ছে।

—এ আমি নতুন যাচ্ছি নাকি বক্তৃতা দিতে?

আলো না থাকলেও সূক্ষ্মচোখে দর্শন বইটা পর্য্যবেক্ষণ করতে লাগলো। বল্‌লে,—তা জানি না, কিন্তু আমার ইচ্ছেটা নতুন।

ইন্দ্রাণী চঞ্চল হ'য়ে বল্‌লে,—যেতে না দেবার তোমার কারণ কী? এ কোনো রাজনীতিক সভা নয়, নিতান্ত একটা সামাজিক ব্যাপার।

—কারণ যাই হোক্, আমার মত নেই, তাই যথেষ্ট।

ইন্দ্রাণী বল্‌লে,—তুমি মত দেবার কে? কে তোমার মতের জন্যে বসে' আছে? যা সর্ব্বতোভাবে ন্যায়, করণীয়, তা'র বিরুদ্ধে তোমার একটা মতের দাম কী?

দর্শন কঠিন হ'য়ে বল্‌লে,—আমি তোমার স্বামী, আমার মতের পক্ষে তাই যথেষ্ট দাম।

—থাক্, ইন্দ্রাণী নিষ্ঠুর শ্লেষ করে' উঠলো: এটা থিয়েটার নয়, এরকম পালোয়ানি করবার জায়গা উপন্যাসে। আমি যাবো।

—আমি তা'দের ফিরিয়ে দিলাম, তবু তুমি যাবে?

—হ্যাঁ। আমাকে না জিগ্‌গেস করে' তা'দের ফিরিয়ে দিয়ে তুমি অন্যায় করেছ। আজ সাত দিন ধরে' সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক হ'য়ে গেছে, এখন শেষ সময় 'না' বললে চলবে কেন? তা'রা আমায় কী ভাববে?

—কিন্তু, ইন্দ্রাণীর এই তেজোদৃপ্ত ভঙ্গির কাছে নিজেকে দর্শনের কেমন অসহায় লাগতে লাগলো: আমার বারণ করে' দেয়ার পরও যদি তুমি যাও, তা হ'লে আমার মুখ থাকে কোথায়?

—আর না গেলেই আমার মুখ একেবারে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠবে, না? ইন্দ্রাণীর ঠোঁট দু'টো থর্‌থর্ করে' কাঁপতে লাগলো: খালি তোমারই একটা সম্মান আছে, আমার নেই? আমি তা'দের কথা দিয়েছি, আমি যাবো। বলে' সে ডাক দিলো: মদন! মদন!

হাতের কাজ ফেলে মদন এলো ছুটে।

দর্শনের দিকে দৃক্‌পাত না করে' ইন্দ্রাণী হুকুম দিলে: শিগ্‌গির একটা গাড়ি ডেকে নিয়ে আয়।

মদন গাড়ি ডাকতে চলে' গেলে দর্শন গম্ভীর অথচ ব্যথিত মুখে বল্‌লে,—এতো করে' 'না' বলা সত্ত্বেও তুমি যাবে? আমাকে তুমি মানবে না কিছুতেই?

অলক্ষ্যে দর্শন যেন ক্রমে-ক্রমে জুড়িয়ে আসছে—যা তা'র স্বভাব। কিন্তু ইন্দ্রাণী এক ইঞ্চি মাথা নোয়ালো না; কাঁধের উপর ব্রোচটা ঠিক করতে-করতে বল্লে,—এই ক্ষেত্রে তোমাকে মানা তো অন্যায়কে মানা, অসংলগ্ন, তুচ্ছ একটা খেয়ালকে প্রশ্রয় দেয়া মাত্র। বলে' সে উঠানের উপর নেমে এলো, রাস্তায় বারে-বারে উঁকি মারতে লাগলো গাড়ি নিয়ে মদন এসে পৌঁছুলো কি না।

অসহিষ্ণু হ'য়ে সে আপনমনে বল্লে,—অনেক দূর, এদিকে দেরিও হ'য়ে গেলো বেজায়, নইলে সোজা হেঁটেই চলে' যেতাম ঠিক। মহা মুস্কিলেই পড়া গেলো দেখছি। ওঁর মতামত শুনে আমার ওঠ-বোস করতে হ'বে! না গেলে আজ যা আমার অখ্যাতি হ'বে, তা'র তুলনায় কী ওঁর এই মুখভার! ভদ্রলোকের আর কিছু না থাক্, স্বামিত্বজ্ঞানটি ষোলো আনা।

মদন ঠিকমতো গাড়ি নিয়ে এলো অবিশ্যি। তা'কে কোচবাক্সে চড়িয়ে নিয়ে ইন্দ্রাণী সটান বেরিয়ে পড়লো। রাগের চেয়ে দর্শনের ব্যথাই হচ্ছিলো বেশি। সেই মুহূর্তে কী যে সে করতে পারে কিছু ঠিক করতে পারলো না। বেদনায় মুহ্যমান চোখে দূরায়মান গাড়িটার দিকে সে চেয়ে রইলো।

সতেরো

মিটিংয়ে ইন্দ্রাণীর রচনাটা প্রবলকণ্ঠে অভিনন্দিত হয়েছে, সেই আনন্দে দর্শনকে সে মনে-মনে ক্ষমা করতে পেরেছিলো। ইচ্ছে ছিলো বাড়ি ফিরে তা'র সঙ্গে আর স্বামিত্বের সম্মানজনক দূরত্ব না রেখে একবারে বন্ধুর মতোই অন্তরঙ্গ হ'য়ে উঠবে! কিন্তু রাত করে' বাড়ি ফিরে এ-ঘর ও-ঘর করে' কোথাও সে দর্শনের দেখা পেলো না। তা'র রচনা ও রচনা-পড়া শুনে জনতার চারদিক থেকে মাঝে-মাঝে কী-সব সপ্রশংস উক্তি উচ্ছ্বসিত হচ্ছিলো দর্শনের কাছে তা'র একটা আন্‌কোরা, টাট্‌কা রিপোর্ট দিতে না পেরে ইন্দ্রাণীর খানিক রাগই হচ্ছিলো বলতে হ'বে। এই বুঝি তা'র বেড়াতে যাবার সময়। ইন্দ্রাণীর ফিরতে দেরি হচ্ছে বলে' পথে এগিয়ে দেখতে গেছে নাকি? ফিরতে ইন্দ্রাণীর দেরি হ'লে তা'র সপ্তভুবন তো একবারে রসাতলে যায়! নিজেকে ব্যর্থ ভেবে ফ্যাসান করে' অভিমানের একটা মেয়েলি অভিনয় করতে হয়তো অন্ধকারে একটু পাইচারি করতে গেছে। খিদের সময় হ'লেই বাছাধন আবার সুড়সুড় করে' বাড়ি ফিরে আসবেন।

ইন্দ্রাণী

আলো জ্বেলে একা ঘরে ইন্দ্রাণী কখনো চুপ করে', বসে', কখনো-বা ছটফট্ করে' এ-দিক ও-দিক হেঁটে সময় কাটাতে লাগলো। দশটা প্রায় বাজে—মফঃস্বলের সহরের পক্ষে রাত্রি এখন প্রায় তিন প্রহর, এখনো দর্শনের দেখা নেই। আজ তা'কে ফেলে কিছুতেই ইন্দ্রাণী একা ভাতের থালা নিয়ে বসতে পারছে না। জান্‌লার বাইরে চেয়ে দেখলো আগাগোড়া জমাট অন্ধকার, প্রায় এক মাইল দূরে-দূরে মিটমিট করছে ল্যাম্প-পোস্‌ট্, কোথাও নেই এক ফোঁটা শব্দ, কারো ফিরে আসবার অস্ফুট সূচনা। অন্ধকার যে কতো বড়ো ভয়ের জিনিস তা যেন আজ দর্শনের অনুপস্থিতিতে বেশি করে' প্রতিভাত হচ্ছে। ইন্দ্রাণী কী করবে, অন্ধকারে যেন সে কোনো-কিছুর কিনারা করতে পারলো না। লণ্ঠনটা নিয়ে চলে' এলো সে দর্শনের ঘরে; ক্ষিপ্র, স্নিগ্ধ হাতে সে তা'র জিনিস-পত্র ঘাঁট্‌তে বস্‌লো। কোথাও যে সে চলে' গেছে কোথাও নেই তা'র এতটুকু সঙ্কেত: যেখানে যতোটুকু বিশৃঙ্খলা, যতোটুকু পারিপাট্য—সব আগেকার মতো তেমনি—কোনো আকস্মিকতায় নেই কিছুমাত্র বিস্মিত হ'বার হেতু। স্তূপাকার করে' পড়ে' আছে ময়লা জামা-কাপড়, এখানে কতোগুলি পোড়া সিগারেটের টুক্‌রো, ওপাশে ছেঁড়া কাগজে-বইয়ে একরাজ্যের আবর্জ্জনা, মশারির দুই কোণের দড়ি দু'টো পড়েছে খসে', গত রাতের বিছানাটা এখনো তোলা হয় নি। জিনিস-পত্র নিয়ে নাড়াচাড়া করতে-করতে ঘরের চেহারা দেখে তা'র চোখ দু'টো হঠাৎ ব্যথায় যেন টন্‌টন্ করে' উঠলো। ডাকলো: মদন।

ইন্দ্রাণী

মদনরা এখনো খেতে পায় নি, তাই মুখ কাঁচুমাচু করে' দরজার একপাশে দাঁড়িয়ে ভীরু গলায় সে জিগ্‌গেস করলে,—কেন মাঠান্?

ইন্দ্রাণী তা'র মুখের উপর যেন একগাদা বারুদ ছুঁড়ে মারলো: বাবুর ঘরটা এমন একটা আস্তকুঁড় করে' রেখেছিস, তোকে মাইনে দেয়া হয় কেন জানতে পাই? সমস্ত দিন ধরে' বাসি বিছানা পড়ে', ঘরে জমে' আছে একহাঁটু ধুলো—এ সব কে দেখে জিগ্‌গেস করি?

মদন বিনীত হ'য়ে বল্‌লে,—আমি কী করবো মাঠান, এ-ঘরের কিছু কাজ করতে গেলেই বাবু আমাকে তেড়ে আসেন। বলেন: আমার ঘরের কোনো জিনিসে তুই হাত দিতে পারবি না। থাক্ আমার বিছানা-পত্তর অমন ছত্রখান হ'য়ে। তা, কাজ করতে না দিলে আমি কী করবো বলো, মাঠান্।

ইন্দ্রাণীর মুখ বিষাদে হঠাৎ গম্ভীর হ'য়ে এলো। চোখ নামিয়ে এটা-ওটা ঝেড়ে-পুছে তুলে রাখতে-রাখতে বল্‌লে,—থাক্, কাজ না করার একটা ছুতো পেলেই তো তোদের পোয়া বারো। যা, তোরা দু'জনে খেয়ে নে গে। আমাদের দু'জনের ভাত একসঙ্গে করে' ঠাকুরকে ঘরে দিয়ে যেতে বল্। উনি এলে আমি আলাদা করে' বেড়ে দিতে পারবো।

দরজার থেকে সরে' যেতে-যেতে মদন বল্‌লে,—বাবু তো এখনো এলেন না, মাঠান।

ইন্দ্রাণী যেন হঠাৎ চম্‌কে উঠলো। বল্‌লে,—কেন আসছেন না কে জানে? বাবু কোথায় যেতে পারেন কিছু বলতে পারিস, মদন?

মদন বল্‌লে,—কী করে' জানবো, মাঠান। আমি তো সেই তোমার সঙ্গে গেলাম।

—কিন্তু ঠাকুর কিছু বলতে পারে? তা'কে একবার জিগ্‌গেস কর্‌ তো গিয়ে, বেরুবার সময় তা'কে কিছু বলে' গেছেন কিনা।

—তা'কে জিগ্‌গেস করেছিলাম, মাঠান। সে কিছুই জানে না বল্‌লে।

—আচ্ছা, যা। দশটা কখন বেজে গেছে। মিছিমিছি তোরা কেন উপোস করে' থাকবি?

ইন্দ্রাণী সযত্নে ঘরের সংস্কার করতে লাগলো, নতুন করে' পাতলো বিছানা, গুছিয়ে দিলো টেবলটা, মেঝেতে অণুতম ধূলিকণাটি পর্য্যন্ত থাকতে দিলো না। আজকে দর্শনের এই অনুপস্থিতি যেন তা'কে অনুচ্চারিত, গভীর ধ্বনিতে ডাক দিয়ে এনেছে। আরো কতোক্ষণ কাট্‌লো। মদন আর ঠাকুর খাওয়া-দাওয়া সেরে বারান্দায় ঘুমোবার জোগাড় করছে। দর্শনের তবু দেখা নেই।

দুশ্চিন্তায় শ্রান্ত হ'য়ে-হ'য়ে শেষকালে ইন্দ্রাণী দর্শনের বিছানায়ই গা ঢেলে শুয়ে পড়লো। থেকে-থেকে একটু তন্দ্রা আসছে, আর অমনি মনে হচ্ছে এই বুঝি কা'র পায়ের শব্দে তা'র ঘুম গেলো ভেঙে। এমনি ঝিমুতে-ঝিমুতে কখন তা'র সত্যি-সত্যিই ঘুম এসে যাবে বা। দর্শনের চোখে প্রথম বিস্ময়ের ঘোর সে হয়তো আর দেখতে পাবে না। বিশ্বাসের অতীত সেই বিস্ময়: তা'র ঘর-দোর আয়নার মতো ঝক্‌ঝক্‌ করছে,

আর চারদিকের এই ফেনায়িত পরিচ্ছন্নতার মাঝে, ঠিক তা'র বিছানার উপর শুয়ে কিনা ইন্দ্রাণী, লজ্জায় লীলায়িত, প্রতীক্ষায় ভঙ্গুর। এমন একটা দৃশ্য একা সে দর্শনকে দেখতে দেবে, আর সে নিজে থাকবে ঘুমিয়ে, এ কখনো হ'তে পারে ?

না, এগারোটাও ক্রমশ বাজতে চল্‌লো, কবিত্ব করবার আর সময় নেই। কিন্তু রাত্রিকালে ইন্দ্রাণী কোথায় তা'র খোঁজ করতে পাঠাবে ? এখানে এসে অবধি কোথাও সে আড্ডা দেয় না, তা'র পরিচিত কোনো বাড়ি নেই, বন্ধু নেই—আছে বলে' ইন্দ্রাণী অন্তত জানে না—কোথায় তা'র যাবার সম্ভাবনা ? ইন্দ্রাণী চোখে অন্ধকার দেখতে লাগলো। তবে সে রাগ করে' বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গেছে নাকি ? কোথায়ই বা সে যাবে ? এ-সংসারে ইন্দ্রাণী ছাড়া তা'র আর আশ্রয় কোথায় ?

সারা রাত শুয়ে-বসে' জান্‌লা দিয়ে চেয়ে থেকে ক্ষণে-ক্ষণে ভূত দেখে ইন্দ্রাণী কোনো রকমে অন্ধকার সাঁৎরে ভোরের কিনারে পার হ'য়ে এলো। কিন্তু দিনের আলোতেও দর্শনের টিকি দেখা গেলো না।

ইন্দ্রাণী তা'র আপন মনে নেয়ে-খেয়ে স্কুল করতে চলে' গেলো; ঠাকুর-চাকরকে বলে' গেলো: যদি বাবু এর মধ্যে ফেরেন, আমাকে ইস্কুলে গিয়ে চুপিচুপি খবর দিয়ে আসিস্।

স্কুলে গিয়ে রোজকার মতো ইন্দ্রাণী কাজ করে' চল্‌লো। মনে-মনে যে সে এতো বড়ো একটা উদ্বেগ পুষে বেড়াচ্ছে মুখে নেই তা'র এতোটুকু চিহ্ন। এতো বড়ো একটা দুঃসংবাদ সে

তার সখী-শিক্ষয়িত্রীদের কাছে পর্য্যন্ত ভাঙলো না। যা হয়েছে, যেন ভালোই হয়েছে। এখানে চাকরি করতে আসা অবধি এই যেন সে প্রতি মুহূর্ত্তে সমস্ত দেহ-মন দিয়ে কামনা করে' আসছিলো।

স্কুল করে' বাড়ি ফিরে এসে আর তা'র সন্দেহ রইলো না কালকের ঐ ঝগড়ার জন্যেই তা'র স্বামী-দেবতাটি বিবাগী হয়েছেন। এতোদিনে তা'র স্বামিত্বে লেগেছে ঘা, ও এতোদিনে বুঝেছে সে তা'র অপৌরুষের জ্বালা। স্বামিত্বের নমুনা কী চমৎকার। বশীকরণ নয়, ত্যাগ; ভোগ নয়, বিসর্জ্জন। শেষকালে একেবারে বাণপ্রস্থ। এই স্বামীর জন্যে আবার তা'র এতো মায়া।

সত্যি-সত্যি সে যেন আর ফিরে না আসে, কোনোদিন আর ফিরে না আসে তা'র কাছে। ইন্দ্রাণী তা'র সংসারের পাট তুলে দিলো, চলে' এলো সে মিস্‌ট্রেস্‌দের কোয়ার্টারে। তবু যদি দর্শন মা'র কোলে বিকেলের খেলা থেকে ফিরে-আসা ছেলের মতো তা'র কাছে এসে ফের আশ্রয় চায়, সে তা'কে দেবে না সে-আশ্রয়, তা'কে কায়মনোবাক্যে অস্বীকার করবে, তা'র স্বামিত্বকে দেবে ধূলিসাৎ করে'। সে এখন মুক্ত, ঝড়ের মতো জোরে সে এখন ঝপ্‌টা দিয়ে চল্‌বে, মান্‌বে না সে আর কোনো সঙ্কীর্ণ জীবন-প্রণালী, বইবে না আর সে কারুর মতামতের আবর্জ্জনা। এই সে বেশ থাকবে, আপনাতে সম্পূর্ণ, আপনাতে স্বপ্রকাশ। বয়ে' গেছে তা'র আর দর্শনের খোঁজ করে' বেড়াতে। যদি সে সত্যিই যাবার মন করে' গিয়ে থাকে,

যাক,—আর যেন কোনোদিন না এখানে ফিরে আসে। ইন্দ্রাণী বাঁচ্‌লো।

অঙ্কের মিস্‌ট্রেস্‌ চারুলতা চিম্‌টি কেটে বল্‌লে,—নীড় ভেঙে গেলো দেখি। ব্যাপার কী? কর্ত্তাঠাকুর গেলেন কোথায়?

সহজ সুরে ইন্দ্রাণী বল্‌লে,—কী-এক ধুয়ো ধরেছিলো পত্নীরত্নং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি। জোর করে' ঠেলেঠুলে কল্‌কাতায় পাঠিয়ে দিলাম। কাঁহাতক আর বৌর কাঁধে চড়ে' খাবে, মাঠে এবার একটু চরে' খেতে শিখুক।

চারুলতা ঝঙ্কার দিয়ে উঠলো: রীতিমতো লজ্জা করা উচিত।

—নিশ্চয়, পুরুষমানুষের তো লজ্জা নেই, আছে কেবল বিজাতীয় রাগ।

চারুলতা ঠোঁটের পাশে বাঁ গালের খানিকটা মাংস একটু কুঁচকে জিগ্‌গেস করলে: তুই বিয়ে করতে গেলি কী দেখে?

নিচের ঠোঁটটা উল্‌টে ইন্দ্রাণী বল্‌লে,—কি-জানি কী দেখে। আমার কপাল দেখে আর-কি।

—আমি ভেবে সত্যিই অবাক হচ্ছি ইন্দ্রাণী, তোর মতো একটা রত্ন কী বলে' এমন একটা—এক পয়সা কামাবার যার মুরোদ নেই—

—হ্যাঁ, ইন্দ্রাণী মুচ্‌কে একটু হাসলো: কী যে তখন পাগলামি পেয়েছিলো কে জানে। ভাবলাম বিয়ে করে' না-জানি কী স্বর্গসুখই সম্ভোগ করা যাবে।

চারুলতা হাত ঘুরিয়ে বল্‌লে,—সুখের মধ্যে তো এই কে-না-কে-এক সোয়ামির জন্যে চাকরি করে' মরা।

—আর বলিস্ নে। কোথায় নিজে হাত-পা ছড়িয়ে বসে' আরাম করবো, না, এই দুর্ভোগ।

—ভদ্রলোক শুনেছি এম. এ. ?

—আমিও ভাই, তথৈবচ। শুধু শুনেইছি, গেজেটও দেখিনি, ডিপ্লোমাও দেখি নি। লোকে বলে, শুনেছি হিস্‌ট্রিতে নাকি ফাষ্টো কেলাশ ফাষ্টো।

—বলিস্ কি ? চেহারাটাও তো দেখতে প্রায় ভদ্রলোক !

—হ'বে না ? ইন্দ্রাণী হেসে উঠলো : এতো খেলে আর ঘুমুলে কারু চেহারা ভদ্রলোক না হ'য়ে পারে ? ভাবনা করবার তো দুনিয়ায় কিছু নেই।

চারুলতা মুখ বেঁকিয়ে বল্‌লে,—তবু নিজে সে খাটবে না ? তোকে পেয়েছে বেশ।

—খাটবে কোন দুঃখে ? মাগ্‌না এমন স্ত্রী পেয়েছে, তা'র তো সোনায় সোহাগা। স্ত্রীতে স্ত্রী, আবার টাকা রোজগারে শিক্ষয়িত্রী।

চারুলতা খেঁকিয়ে উঠলো : তুইই বা কেন অমন অকর্ম্মণ্যের জন্যে মিছিমিছি মরতে যাবি ?

—ওর জন্যে না ঘেঁচু। ইন্দ্রাণী গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে কৌতুক মিশিয়ে বল্‌লে,—আমার নিজের জন্যে খাটছি, নিজের পেটটা তো চালাতে হ'বে। কী না-জানি বলে পাড়াগেঁয়ের মেয়েরা—গতরের নাম পরশমণি। আমার তো আর খেয়ে-দেয়ে কাজ

নেই, ওর জন্যে চাকরি করতে বসবো! যাক্ না যেখানে খুসি, গেলেই তো হাঁপ ছেড়ে বাঁচি বাপু। ফিরে আসবে আবার? আহাহা, তা'র জন্যে হাতে মোয়া নিয়ে বসে' আছি না?

আঠারো

কল্‌কাতায়, শ্বশুরবাড়িতে, স্বামীর এই তিরোধানের খবর দিয়ে ইন্দ্রাণী একটা চিঠি লিখলে পারে, এই দুঃসংবাদটা সামাজিক সম্পর্কের খাতিরেও তা'র একবার জানানো উচিত হয়তো,—কিন্তু কথাটা মনে হ'তেই তা'র কেমন হাসি পেতে লাগলো। দর্শন যে রাগ করে' বাড়ি ছেড়ে চলে' গেছে—ছোট ছেলে যেমন মা'র উপরে রাগ করে' বেরিয়ে যায়—এ-খবরটা চারুলতাকে জানাতে পর্য্যন্ত তা'র লজ্জা করেছিলো। স্ত্রীর উপর প্রভুত্ব খাটাতে গিয়ে স্ত্রীকেই মানুষ বাড়ির বা'র করে' দেয়; খিড়কির দোর দিয়ে নিজেই যায় চুপি-চুপি বেরিয়ে—এমন লজ্জার কথা মহাভারতের কোথায় কিন্তু লেখা নেই। আর, দাম্পত্যকলহ বা অপ্রণয়ের ফলে যারা সব ঘর ছেড়েছে শোনা যায়, সবাই তো মেয়ে, একটা পুরুষ শেষকালে মেয়ের মতো কুলত্যাগ করলো, এমন কথা কালি-কলম দিয়ে কারু কাছে লিখতেও তা'র মাথা কাটা যাচ্ছে।

কিছু লিখতে হ'লো না, যা ভেবেছিলো তাই। নিভা চিঠি লিখে জানিয়েছে, দর্শন সশরীরে একদিন বাড়ি এসে হাজির,

একেবারে খালি-হাতে, এককাপড়ে। কেউ কিছু জিগ্‌গেস করলে কথা বলে না, চেহারা দেখলে মনে হয় দুরবস্থার একশেষ। ব্যাপার কী, ইন্দ্রাণী ?

ইন্দ্রাণী গভীর একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে তক্ষুনি কাগজ-কলম নিয়ে চিঠি লিখতে বসলো। অত্যন্ত দ্রুত, টানা অক্ষরে —যাতে স্পষ্ট মনে হয় সে নিদারুণ চটেছে—লিখলো: তা'কে আমি বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছি, মেজ-দি, পুরুষরা যাকে ত্যাগ করা বলে। আইনে এ-ক্ষেত্রে কী বিধান আছে জানি না, আমি মাস-মাস তা'কে কিছু-কিছু দেবো না-হয় খোরপোষ বাবদ। তা'কে বলো, দরকার হ'লে আমি আরেকটা বিয়েও করতে পারি যে-কোনো মুহূর্তে। আমি সকল দায় থেকে খালাস হ'য়ে গেছি একেবারে।

যা ভেবেছিলো তাই। পায়রার মতো এখানে-ওখানে খুঁটে-খুঁটে ক্ষুদ-কুঁড়া খেয়ে আবার সে ফোকরে গিয়ে ঢুকেছে, মা'র আঁচলের ছায়ায়, দাদাদের করুণার জলসত্রে। আবার সেই সংসারের মাঝে সঙ্কুচিত, কৃপাকুণ্ঠিত হ'য়ে থাকবার তা'র দরিদ্রতা। ইন্দ্রাণীর সমস্ত শরীর রি-রি করতে লাগলো। এতো বড়ো একটা প্রভু হ'য়ে সে কি না আবার কাঁধে নিলো ভিক্ষার ঝুলি। ভাবতেও ইন্দ্রাণী মরে' যাচ্ছে।

নিভাকে সেই চিঠি লেখার পর ও-দিক থেকে আর উচ্চবাচ্য নেই। ইন্দ্রাণীর এই উদ্ধত হঠকারিতায় হয়তো গেছে ছিঁড়ে সেই রঙিন আবহাওয়া যা সে এতোদিন ধরে' রচনা করে'

রেখেছিলো তা'র টাকার রশ্মিজালে। তা'র এই কুৎসিত টাকার অহঙ্কার—যাতে সে তা'র স্বামীকে পর্য্যন্ত অস্বীকার করলো। এতোটা কেউ আর সহ্য করতে পারলো না।

তা'তে বয়ে' গেছে ইন্দ্রাণীর। চোটে সে 'বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতে লাগলো, এমন কি আজকাল রাজনীতি ঘেঁসে বক্তৃতা। হিন্দুসমাজে বিপ্লব আন্‌বার জন্যে ছোট-খাটো একটা খাণ্ডবদাহন। বিবাহ হচ্ছে জীবনের একটা কলঙ্ক, তা'র স্বতঃস্ফুর্ত্ত বিকাশের পক্ষে একটা যন্ত্রণাদায়ক অন্তরায়, একটা মাত্র প্রচলিত কুসংস্কার —তা নিয়ে সুরু হ'লো যতো নিদারুণ অগ্ন্যুৎপাত। সমস্ত সত্যের চেয়ে বড়ো হচ্ছে যার-যার নিজের অস্তিত্ব, সমস্ত দায়িত্বের চেয়ে বড়ো হচ্ছে নিজের বাঁচবার দায়িত্ব, নিজের বাড়বার অধিকার, তা'র কাছে তুচ্ছ স্বামী, তুচ্ছ যতো দেশাচার। ইন্দ্রাণী সারা সহর তোলপাড় করে' ছাড়লো, খবরের কাগজের নিজস্ব সংবাদ-দাতাদের বাড়ি গিয়ে-গিয়ে নিজে অনুরোধ করলে: খবরগুলো খুব জম্‌কালো করে' কাগজে বা'র করাবেন।

তা'তেও ইন্দ্রাণীর ক্ষান্তি নেই। মাসিক কাগজে—ইংরিজিতে-বাংলায়, সে নিদারুণ, নৃশংস প্রবন্ধ লিখতে লাগলো। এমন সব তা'দের তেজস্কর আইডিয়া যে তা নিয়ে গল্প লিখতে গেলে যুবক-যুবতীর চরিত্র তা'তে দূষিত হচ্ছে বলে' দস্তুরমতো তা'র সাজা হ'য়ে যেতো। প্রবন্ধে শারীরিক কোনো নির্দ্দিষ্ট দৃষ্টান্ত থাকে না বলে'ই বাঁচোয়া। চারদিকে ঢি-ঢি পড়ে' গেলো। শেষে গোপনে-গোপনে এমন পর্য্যন্ত কথা উঠছে এখন, এমন শিক্ষয়িত্রীকে স্কুলে বহাল রাখা আর ঠিক হ'বে কিনা।

ইন্দ্রাণী মুচ্‌কে একটুখানি হাসলো মাত্র। বল্‌লে,—ওরে বাবা, চাকরি যাবে কী! এ-সব কাজে এখন থেকে তবে ঢিল দিতে হয়, কী বল্‌, চারু? চাকরি গেলে খাওয়াবে কে?

চারুলতা বল্‌লে,—দিন কতক লাফালাফি করে' তো এই দশা! স্বামী তো গেলোই, চাকরিটিও প্রায় যায়।

—স্বামী গেছে গেছে, চাকরি যাবে কী। আজই গিয়ে সেক্রেটারির সঙ্গে দেখা করতে হয়, নাক-কান মলে' একটা মুচ্‌লেকা সই করে' দিয়ে আসি। বলে' ইন্দ্রাণী হাসলো।

—হ্যাঁ, আমাদের কী ও-সব মানায়? চারুলতা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে: মাথার উপর আমাদের কেউ নেই, স্বাধীন হয়েছি বলে' তো আর পুরুষ হ'য়ে যেতে পারিনি। যতোই কেননা তড়পাই, সেই মেয়ে—সেই মেয়েই আমাদের থাকতে হ'বে চিরকাল।

—না রে? মেয়ে, সেই মেয়েই আমাদের থাকতে হ'বে? বলে' চারুলতাকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরে' ইন্দ্রাণী খিলখিল করে' হেসে উঠলো।

মাঝে-মাঝে কথাটা মনে হ'লেও, গোড়ার ক'মাস দর্শনকে ইন্দ্রাণী টাকা পাঠায় নি—যাকে সে আখ্যা দিয়েছিলো দর্শনের ন্যায্য মাসোহারা বলে', ক্রিমিন্যাল প্রসিডিয়োর কোড্‌-এর ৪৮৮ ধারা অনুসারে বিতাড়িত স্ত্রী যা আদালতের মারফৎ আদায় করে' থাকে। পাঠায় নি, কেনই বা পাঠাবে—তা'র সঙ্গে তা'র আর কিসের সম্পর্ক? কিন্তু ইন্দ্রাণী না পাঠালে তো দর্শনের ভারি বয়ে' গেলো। বিপদে-আপদে তা'র মা আছেন, full-brotherরা

আছে, রক্তের সম্পর্কে তাঁরাই তো তা'র বেশি কাছে, বেশি আপনার। তা'দের কাছ থেকে করুণা কুড়োনো বরং সম্মানের, সেখানে দুঃখ থাকলেও লজ্জা নেই।

নিষ্ঠুর হ'য়ে যখন কিছু ফল হ'লো না, তখন ইন্দ্রাণীও গেলো করুণা দেখাতে। তা'র সঙ্গে তারো রক্তের একটা গভীরতরো সম্পর্ক একদিন উচ্চারিত হয়েছিলো বৈ কি, তা'রই অজুহাতে সে-ই বা কেন একটু দয়া করবে না? দুর্ব্বলের প্রতি সমবেদনা দেখাবার মতো বিলাসিতা মানুষের আর কী হ'তে পারে! এই সুখ ভোগ করার এই তো তা'র সময়।

কল্‌কাতায় শ্বশুরবাড়ির ঠিকানায় ইন্দ্রাণী দর্শনের নামে পনেরো টাকা মনি-অর্ডার করলে,—মাত্র পনেরো টাকা, কেননা তা'র যা মাইনে, তা'তে maintenance বাবদ দর্শন তা'র বেশি ডিক্রি পেতে পারতো না যদি অবিশ্যি দর্শন হ'তো পরিত্যক্ত স্ত্রী, আর ইন্দ্রাণী হ'তো দুর্জ্জয় স্বামী। (ইন্দ্রাণী মনে-মনে প্রচুর হেসে নিলো।) আর কুপনে লিখে দিলো স্পষ্ট ইংরাজিতে: তোমার নভেম্বর মাসের মাসোহারা।

দাদাদের কাছে কতো আর হাত পাতবে, বিধবা মা'র প্যাঁটরায় কতো আর রসদ আছে, বড়োজোর একটা টিউসানি জোগাড় করতে পারে, কিন্তু এই ডিপ্রেশানের দিনে কতোই বা তা'র দাম—টাকা ক'টা তা'র ভীষণ কাজে লাগবে নিশ্চয়। একেবারে আকাশফুটো পয়সা—ইজিপ্‌টের মরুভূমিতে manna। দর্শনের নিশ্চয় তা হাতে করে' কপালে এনে ঠেকানো উচিত। এই salary-cut-এর দিনে জলজ্যান্ত পনেরোটা টাকাই বা কে

কা'কে গায়ে পড়ে' দেয় শুনি—কোর্টের হুকুমে মাইনের উপর নিতান্ত একটা attachment না হ'লে! এটুকু কৃতজ্ঞ হ'বার ভদ্রতা সে দর্শনের কাছ থেকে আশা করতে পারে বোধহয়, অন্তত যে এতোগুলি দিন তা'র সংস্পর্শে ছিলো, ছিলো তা'র রক্ষণাবেক্ষণে।

কিন্তু এ কী ভয়ানক কাণ্ড! ইন্দ্রাণী মরে' গেলেও যে তা বিশ্বাস করতে পারতো না।

প্রায় মাসখানেক বাদে সেই মনি-অর্ডার ফেরৎ এলো। দর্শন কল্‌কাতায় নেই, মনি-অর্ডারটা ঠিকানা কেটে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিলো পাট্‌নায় আবু-আস্‌-লেইনে, সেখানেই দর্শন আছে, নিঃসন্দেহ। বড়ো-বড়ো অক্ষরে লাল কালিতে ফর্মটার উপর লেখা—**refused.**

প্রবল, তীব্র আলোর ঝাপ্‌টায় দুই চোখ ইন্দ্রাণীর ধাঁধিয়ে গেলো। ইন্দ্রাণীকে সে না চাইতে পারে, কিন্তু টাকা সে হাত পেতে নেবে না, তা'র জীবনে এমন দুর্ঘটনা কী ঘট্‌তে পারে! বিদেশ পাট্‌নায় সে আছে, অথচ তা'র টাকার দরকার নেই, ব্যাপার কী!

ঐ ঠিকানায় একটা সে চিঠি লিখবে নাকি—তা'র জীবনের প্রথম চিঠি! কথাটা ভাব্‌তেই তা'র গা-ময় চঞ্চল রক্তের নদীতে ঝির্‌ঝির্‌ করে' আবেগের হাওয়া দিলো। এতোদিন তা'দের এই সান্নিধ্যের মাঝে শারীরিক একটা ব্যবধান থাকলেও ছিলো না স্থানের ব্যবধান—আজকে দেখা গেলো স্থানের সঙ্গে-সঙ্গে শরীরের বিচ্ছেদটাও অনেক দূর পর্য্যন্ত প্রসারিত হ'য়ে পড়েছে।

ই ন্দ্রা ণী

তা'র জীবনের পটভূমি যেন অপসৃত হ'য়ে গেছে, তা'র জীবনের পারিপ্রেক্ষিত গেছে বদ্‌লে—একটা চিঠি তা'কে লিখলে হয়। কিন্তু চিঠি লিখতে গেলেই—আজ তা'র মন সানন্দ সন্দেহে এমন ঘন-ঘন দুলে' উঠেছে—হয়তো শব্দের আবহাওয়ায় ঘনীভূত হ'য়ে উঠবে আবেগের কুয়াসা। দু'-দু'বার চিঠি লিখতে সে বসলোও, কিন্তু এই তা'র প্রথম চিঠি, দর্শন কল্‌কাতায় না থেকে পাটনায় (যতোদূর ইন্দ্রাণী জানে সেখানে তা'র কোনো বিশেষ আত্মীয় নেই), যতোই মনে এই মোহ সঞ্চারিত হচ্ছে, ততোই তা'র চিঠিতে এসে যাচ্ছে অস্ফুট একটি কবিতার দুর্বলতা। চিঠি লেখা আর হ'লো না, কোনো পুরুষের কাছে চিঠিতে নামমাত্র সেন্টিমেন্ট্ দেখাতেও তা'র ভীষণ লজ্জা করতে লাগলো।

—মুচলেকা সই করবে না হাতি! ইন্দ্রাণী হাঁপাতে-হাঁপাতে চারুলতার ঘরে এসে হাজির: আমার বয়ে' গেছে এই চাকরি করতে!

চারুলতা অবাক হ'য়ে জিগগেস করলে: সেক্রেটারি শেষকালে তোকে কাগজে সই করে' দিতে বল্‌লেন?

—প্রায় তাই। বল্‌লে কিনা মুখে অন্তত স্বীকার করতে হ'বে যে কোনোদিন আর পলিটিক্স্ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করবো না। মুখে অন্তত প্রকাশ করতে হ'বে যে আমি আমার এতোদিনের আচরণের জন্যে দুঃখিত। তা হ'লেই নাকি চাকরিটি আমার বজায় থাকে।

—তুই কী বললি?

—বল্‌লাম, থাকুক্। ভবিষ্যতে আমি কী করবো না-করবো তা আমি নিজেই জানি নাকি? আমার মুখের কথায় আমার নিজের পর্য্যন্ত বিশ্বাস নেই।

—তা'র মানে? চারুলতা চম্‌কে উঠলো।

—তা'র মানে চাকরিটা হয়তো গেলো।

—চাকরিটা গেলো? ইন্দ্রাণীর একটা হাত ধরে' চারুলতা ঝাঁকুনি দিয়ে বল্‌লে,—কী বলছিস্, ইন্দ্রাণী? সামান্য একটা মুখের কথার জন্যে এমন একটা চাকরি কখনো যেতে পারে, যখন সামান্য একটা মুখের কথায় আবার তা ফিরিয়ে আনা যায়? তুই কি পাগল হ'লি নাকি?

ইন্দ্রাণী শরীরে একটা তাচ্ছিল্যের ভঙ্গি করে' বল্‌লে,—অমন একটা চাকরি গেলে আমার কী হয়? এর চেয়ে কতো ভালো চাকরি আমি জোগাড় করতে পারবো ইচ্ছে করলে।

—হ্যাঁ, এই বাজারে তোর জন্যে চাকরি পড়ে' আছে পথে-ঘাটে। চারুলতা চোখ-মুখ তীক্ষ্ণ করে' তা'কে সতর্ক করলে: মাথার উপর তোর কেউ নেই ইন্দ্রাণী, মারা পড়বি।

ইন্দ্রাণী তরলকণ্ঠে বল্‌লে,—আমার আবার চাকরির অভাব! চাকরি আমার হাতের মুঠোয়। যে কোনো মুহূর্ত্তে আমি আমার চাকরিতে গিয়ে বসতে পারি। আগে শুধু রূপ আর বিদ্যে ছিলো, এখন আবার কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা হয়েছে। আমার চাকরি হ'বে না তো হ'বে কা'র! বলে' ইন্দ্রাণী হাসির ঘায়ে টুকরো-টুকরো হ'য়ে পড়লো, দম নিয়ে বললে,—মাথার উপর কেউ নেই বলে'ই তো এমন সাধা চাকরিটা অনায়াসে ছাড়তে পারলাম। নইলে চাকরি

করে' আজো পতিদেবতাকে খাওয়াতে হ'লেই হয়েছিলো আর-কি। মুক্তির এমন একটা তীব্রতা পর্য্যন্ত অনুভব করতে পারতাম না। ইন্দ্রাণী চারুলতার পিঠ ঠুকে দিলো: বিয়ে করিস্ নি, বেঁচে গেছিস্, চারু। যখন যা খুসি করা যায়, মাথার ওপর কেউ নেই যে সাধ করে' এসে বাধা দেবে। আমিও অনেক চক্রান্ত করে' এই তোদের অবস্থায় এসে পড়েছি। বলে' তা'র আবার আরেক দমক হাসির শিলাবৃষ্টি।

চারুলতা তো এ-কথা ভেবেই পেলো না এমন দুর্দ্দিনে এমন একটা মোটা চাকরি হারিয়ে কি করে' কোনো লোক হাসিতে এমন উথ্‌লে উঠতে পারে। তারপর যে মেয়ের মুখের উপর সমস্ত আশ্রয়ের দরজা সজোরে বন্ধ হ'য়ে গেছে। তবু বোঝা যেতো যদি নতুন করে' বিয়ে হ'তো ইন্দ্রাণীর কোনো টাকাতে মাড়োয়ারির সঙ্গে! যা একখানা তা'র বিয়ে হয়েছিলো, তা'তেও তো দিয়েছে সে ইস্তফা—তা'র আবার কিনা মুখের কথার বিলাসিতা করা! পরে না পস্তায় তো কী বলেছি।

বিজ্ঞের মতো মুখ করে' চারুলতা জিগ্‌গেস করলে: এখন কী করবি?

ইন্দ্রাণী হেসে বল্‌লে,—আজ আর ইস্কুলে না গিয়ে সারা দিন বসে' ভাব্‌বো। কী করা যায়!

—কী করা যায়, সারা জন্ম বসে'ই ভাবতে হ'বে। এমন একটা চাকরি কেউ ছাড়ে?

ই ন্দ্রা ণী

স্কুলের ছুটির পর চারুলতা ছুটতে-ছুটতে ইন্দ্রাণীর কাছে এসে হাজির। নিবিষ্ট মনে ইন্দ্রাণী তখন ঘরের মেঝের উপর তা'র কাপড়-জামা ছড়িয়ে পরিপাটি করে' বাক্স গুছোচ্ছে।

খুসিতে চারুলতা একেবারে ভেঙে পড়লো: তোর চাকরি যায় নি তো, ইন্দ্রাণী। কী বলছিলি তখন তুই যা-তা!

ইন্দ্রাণী ভুরু নাচিয়ে বল্‌লে,—যায় নি নাকি?

—ককৃখনো যায় নি। কিসের মুচ্‌লেকা সই, কিসের কী undertaking! তোর চাকরি সম্বন্ধে এ নিয়ে কোনো কথাই নাকি হয় নি। খালি সেক্রেটারি তোকে ডেকে জিগ্‌গেস করেছিলেন, পলিটিক্যাল্‌ বক্তৃতা দেয়ায় risk আছে, আপনার কি এ নিয়ে মাতামাতি করা ঠিক হ'বে? এতে চাকরি থাকা-না-থাকার তো কোনোই কথা ছিলো না।

ইন্দ্রাণী একটার পর একটা শাড়ি-ব্লাউজ ভাঁজ করে' রাখতে-রাখতে বল্‌লে,—তুই এতো রাজ্যের কথা জান্‌লি কী করে', চারু?

—বা, আজ হেডমিস্‌ট্রেসের ঘরে যে এই নিয়ে তুমুল কাণ্ড। তোর চাকরি সম্বন্ধে কোনো কথাই ওঠে নি, সেক্রেটারি নাকি কিছুতেই কারু কাছ থেকে কোনো মুচ্‌লেকা দাবি করতে পারেন না। তুইই বল্‌, তা'র বেশি তিনি তোকে কিছু বলেছেন?

ইন্দ্রাণী স্যুটকেইস্‌এর ডালাটা বন্ধ করে' চাবি ঘুরোতে-ঘুরোতে বল্‌লে,—না, তা কিছু বলেন নি বটে। তবে তুইই বল্‌, আমি কী বক্তৃতা দেবো না-দেবো, risk আছে কি না-আছে,

তা নিয়ে আমাকে উপদেশ দেবারই বা তিনি কে! সেই তো যথেষ্ট অপমান। আমার ভালো-মন্দ আমি নিজে বুঝবো, তা'তে কে-না-কে সেক্রেটারির কী মাথা-ব্যথা?

—বা, চারুলতা ঝাঁজিয়ে উঠলো: বললেনই বা, ভুল করে' না-হয় তোর ভালোর জন্যেই বলেছেন, তাঁর উদ্দেশ্য তো ছিলো না তোকে অপমান করবেন। তা'তে চাকরি যাওয়ার কথা ওঠে কী করে'?

ইন্দ্রাণী বস্‌লো এবার তা'র বিছানাটা গুছোতে। মৃদু-মৃদু হেসে বল্‌লে,—চাকরি সব সময়ে যায়, এমন কোনো কথা নেই, চারু, চাকরি মাঝে-মাঝে লোকে ছাড়েও।

চারুলতা স্তম্ভিত হ'য়ে গেলো। বল্‌লে,—এই চাকরিটা তা হ'লে তুই ছাড়লি?

—মানে তাই দাঁড়াচ্ছে দেখতে পাচ্ছি।

চারুলতা বল্‌লে,—কিন্তু ধরা-ছোঁয়া যায় এমন একটা কোনো কারণ চাই তো? এই একটা তোকে অপমান করা হ'লো নাকি?

ইন্দ্রাণী লঘু সুরে বল্‌লে,—কিসে কা'র অপমান হয় বোঝা কঠিন। সকলের চামড়া সমান পুরু নয়, চারু।

—আহাহা, আর ঢঙের কথা বলিস্ নি, কিন্তু নিশ্চয়ই তোর অন্য কোনো মতলোব আছে। চারুলতা নিচু হ'য়ে ঝুঁকে পড়ে' তা'র কানের কাছে মুখ এনে বল্‌লে,—অন্য কোথাও চাকরি পেয়েছিস্ বুঝি?

ইন্দ্রাণী এলো আঁচলে উঠে দাঁড়িয়ে বল্‌লে,—দেখি। কল্‌কাতায় তো প্রথম যাই।

চারুলতা খুসিতে যেন মর্ম্মরিত হ'য়ে উঠলো: বলিস্ কি? কল্‌কাতায় চল্‌লি নাকি?

—হ্যাঁ, আজই।

—একা?

ইন্দ্রাণী হেসে বল্‌লে,—তুই যাস্ তো তবে দু'জন হই।

চারুলতা তা'র মুখের দিকে কৌতূহলী দৃষ্টি ফেলে জিগ্‌গেস করলে: কী চাকরি? এই মাষ্টারির চেয়ে ভালো?

—হ্যাঁ, এর চেয়ে honourable.

চারুলতা তা'র গায়ের উপর ঢলে' পড়ে' বল্‌লে,—যদি পারিস আমার জন্যে একটা চেষ্টা করিস্, ইন্দ্রাণী। মাষ্টারি ছাড়া মেয়েদের কি আর কিছুই করবার নেই?

চারুলতার নিরীহ, নিরানন্দ মুখের দিকে চেয়ে ইন্দ্রাণীর মায়া করতে লাগলো। তা'র রুক্ষ কপালের উপর যে ক'টি বিচ্ছিন্ন চুল এসে পড়েছে আঙুলে করে' আলগোছে একপাশে তা তুলে দিতে-দিতে স্নিগ্ধ গলায় সে বল্‌লে,—চেষ্টা করে' দেখবো, চারু। কিন্তু পারবি তো করতে?

চারুলতা উৎসাহে উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠলো: তুই পারলে আর আমি পারবো না? মাইরি খবর দিস্ ইন্দ্রাণী, যদি কিছু পাস্। আমি আশা করে' থাকবো।

ইন্দ্রাণী তা'র মুখের দিকে চেয়ে করুণ করে' একটু হাসলো, কোনো কথা বললো না।

উনিশ

ইন্দ্রাণী কাউকে কিছু খবর না দিয়ে সটান্ কল্কাতায় চলে' এলো, উঠ্লো—কোথায়ই বা সে উঠতো—শ্বশুরবাড়িতেই। ভোরবেলা সৌদামিনী মুখ ধুতে কলতলায় যাবার পথে দেখতে পেলেন সদর দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে ইন্দ্রাণী। মাথার থেকে মালগুলি নামাবার জন্যে পেছনের কুলিটা আর-কারুর সাহায্যের প্রতীক্ষা করছে।

তা'কে দেখতে পেয়ে সৌদামিনী চোখের পাতা সঙ্কুচিত করে' শুধোলেন: কে, ছোট বৌ না?

ধারে-কাছে চাকর-বাকর কাউকে আস্তে না দেখে ইন্দ্রাণী নিজেই ধরাধরি করে' মালগুলি নামালো যা-হোক্। বল্লে,—হ্যাঁ মা, চলে' এলাম।

সৌদামিনী হঠাৎ মুখ ঝাম্টা দিয়ে উঠলেন: এইখেনে আসবার আর তোমার ঠেকা কিসের? সব সম্পর্কের মুখে তো ঝাড়ু মেরেছ, আবার এই সোহাগপনা দেখাবার কী দরকার?

ইন্দ্রাণী অল্প একটু হেসে শাশুড়িকে প্রণাম করতে গেলো। সৌদামিনী সরে' গিয়ে বল্লেন,—বালাই, ষাট্, আমরা সব

হেজিপেজি লোক, আমাদের সামনে মাথা নোয়াবে কী! কিন্তু হতচ্ছেদ্দা করে' যাকে চাল-চুলো নেই বলে' তাড়িয়ে দিলে শুনতে পাই, আবার তা'র সম্পর্কে এ-পথ মাড়াতে তোমার লজ্জা করলো না একটুও? তোমার জন্যে তো কতো মাঠ-ঘাট পড়ে' আছে চারপাশে, এখেনে এলে কা'র ইষ্টি-কুটুম হ'য়ে?

ইন্দ্রাণী বৃথা বাক্যব্যয় না করে' সোজা উপরে উঠে গেলো। সৌদামিনী ইনিয়ে-বিনিয়ে শোক করতে-করতে তা'র পিছন-পিছন আসতে লাগলেন।

—অথচ এই সোয়ামির জন্যেই তো শুন্‌তে পাই বাপ-মা ছেড়ে চলে' এসেছ, সাত চড়ে রা কাড়ো নি। আর আজ সেই সোয়ামিকেই কিনা তুমি এমনি মুখ খাওয়ালে। টাকার গরম কি এমনি গরম!

ইন্দ্রাণী হেসে বল্‌লে,—পুরুষমানুষ কুলোয় শুয়ে কতো আর তুলোয় করে' দুধ খাবে শুনি? তেমন লোককে কুলোর বাতাস দিয়ে তাড়িয়ে দেয়াই তো উচিত একশো বার।

—কে কা'কে তাড়ায় তা দেখা যাবে। হাতে দু'টো কাঁচা পয়সা আসতে খুব যে কচাল করতে শিখেছ, কিন্তু দর্শন আর এ অসইরন সইবে না মনে রেখো। পাট্‌নায় তা'র চাকরি হয়েছে।

—সত্যি? ইন্দ্রাণী ছুটে নিভাকে পাকড়াও করলে: ব্যাপার কী, মেজ-দি?

নিভার কাছ থেকে বিস্তারিত খবর পাওয়া গেলো। কোন এক সওদাগরি আফিসের পাট্‌নাই ব্র্যাঞ্চে দর্শন বহুকষ্টে একটা

কেরানিগিরি পেয়েছে, মাইনে আপাততো একশো কুড়ি টাকা। ছোট দেখে বাঁকিপুরের দিকে একটি বাড়ি নিয়েছে, কুড়ি টাকা ভাড়া, সঙ্গে নিয়ে গেছে বাড়ির চাকর মনোহরকে, সেই রাঁধে আর বাসন মাজে—চাকর আর ঠাকুর একসঙ্গে। 'প্রথম মাসের মাইনে পেয়েই ঠাকুরপো মা ও বৌদিদিদের নমস্কারি টাকা পাঠিয়ে দিয়েছে, এই মাসে আবার সংসারকে কিছু সাহায্য করবার কথা।

—বা, ইন্দ্রাণী ঝঙ্কার দিয়ে উঠলো: ঐ টাকায় আবার সংসারকে সাহায্য কী! তা'র জন্যে যে আর কিছু খরচ হচ্ছে না তাই তো যথেষ্ট সাহায্য। নিজেকে সাহায্য করতে পারলেই তো আমরা বাঁচি।

সৌদামিনী এখানেও আবার তাড়া দিতে এলেন।

কিন্তু কঠিন কিছু মুখ দিয়ে তাঁর বেরুবার আগেই ইন্দ্রাণী যাবার উদ্যোগ করলো; বল্‌লে,—না মা, এখানে আর আমার কোনো কাজ নেই, আমি চলি।

নিভা হঠাৎ তা'র হাত চেপে ধরলো: কোথায় যাবে?

—বা, ইন্দ্রাণী হেসে বললে,—আমার চাকরিতে।

—তাই তো যাবে। সৌদামিনী রুক্ষস্বরে বললেন,—সোয়ামিকে পর্য্যন্ত তুমি ডিঙিয়ে যেতে চাও, তোমার এমন আস্পর্দ্ধা। কিন্তু এই দেমাক তোমার গুঁড়ো হয়ে যাবে, ছোট-বৌ, দর্শনের আবার আমি বিয়ে দেবো।

ইন্দ্রাণী সিঁড়ি দিয়ে নামতে-নামতে বল্‌লে,—সে-স্বাধীনতা। আমারো আছে, মা। কিন্তু আমি এমনি অন্যায় কথা-কাটাকাটি

করতে আসি নি। কাউকে দিয়ে আমাকে একটা গাড়ি ডাকিয়ে দিন্। আমি চল্লাম।

নিভা বল্লে,—সে কী কথা? এই এসেই তুমি আবার এক্ষুনি চলে' যাবে?

ইন্দ্রাণী গম্ভীর হ'য়ে বল্লে,—কী আর করবো, মেজ-দি। এই বাড়িতে যখন আর জায়গা নেই, তখন আর-কোথাও একটা আশ্রয় খুঁজে নিতে হ'বে তো।

শীতকালে অতো ভোরে সারা বাড়ির ভালো করে' তখনো ঘুম ভাঙেনি, ইন্দ্রাণী একটা ট্যাক্সি নিয়ে বেরিয়ে পড়লো। দিনটার জন্যে উঠলো এসে সে তা'র পুরোনো ছাত্রীভবনে। খাওয়া-দাওয়া করে', বিশ্রাম নিয়ে, বিকেলে দু'চারটে টুকিটাকি দরকারি জিনিস কিনে, রাত্রের দিল্লি এক্স্প্রেসে সে পাটনা রওনা হ'লো।

যতোই কেননা সে মুখে সোনার বাঙলা বলুক, আসানসোল পেরতেই তা'র সত্যিকারের কবিত্ব করতে ইচ্ছা হ'লো। কল্কাতায় যে দর্শনকে চাকরি করতে হয় নি, সংসারের ঐ একান্নবর্ত্তী ডাষ্টবিন্এ, সেটা একটা ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ।

পাটনায় গাড়ি দাঁড়ালো প্রায় বেলা সাড়ে দশটা। আগে খবর দেবার দরকার ছিলো না, একাওয়ালা বাড়ি চিনে স্বচ্ছন্দে পৌছে দিতে পারলো। বড়ো রাস্তা থেকে মোড় ঘুরে গলির মুখে ছোট্ট একখানি দোতলা বাড়ি, কড়া নাড়তেই মনোহর দরজা দিলো খুলে।

—এ কী, বৌমা যে।

ই ন্দ্রা ণী

—হ্যাঁ, তোর বাবু কোথায় ?

—বাবু তো এখন আপিসে, বৌ-মা। আনন্দে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে মনোহর বল্‌লে,—বাবুকে গিয়ে খবর দেব ? এই কতোটুকুন আর পথ ! আমি সব চিনি, বৌ-মা।

—দূর পাগল ! ইন্দ্রাণী বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ে' চারদিক চাইতে লাগলো। সিমেণ্ট-করা ছোট একটি উঠোন, ও-পাশে রান্নাঘর, কল, স্নানের জায়গা, পাইখানা, ঢুকতেই এ-পাশে চাকরের শোবার ঘর শিকল দিয়ে আট্‌কানো। ইন্দ্রাণী বল্‌লে—তা'র চেয়ে আমার জিনিসগুলি নামিয়ে আন্‌। নে, চার আনা পয়সা দে গে এক্কায়ালাকে।

মনোহর ফিরে এলে ইন্দ্রাণী ফের জিগ্‌গেস করলে: তোর বাবু কখন আসবে রে ?

—সেই সন্ধ্যে, বৌ-মা। বড্ড খাটুনি।

—না খাটলে পয়সা রোজগার করবে কি করে' ? দিনে-রাতে আট-দশ টাকার জন্যে তুই কি কিছু কম খাটিস্‌ ?

তারপর রান্নাঘরের কাছে এসে ইন্দ্রাণী জিগ্‌গেস করলে: আজ কী রেঁধেছিলি, মনোহর ?

মনোহর মুখ কাঁচুমাচু করে' বল্‌লে,—ভালো তেমন কিছু রাঁধ্‌তে পারি না, বৌ-মা। প্রায়ই হোটেল থেকে খাবার নিয়ে আসি।

—হ্যাঁ, তোর বাবুর আবার খাওয়া সম্বন্ধে নবাবি আছে। তা তোর ভয় নেই, আমি তোকে রান্না সব শিখিয়ে দেবো।

ই ন্দ্রা ণী

ইন্দ্রাণী উপরে উঠতে লাগলো। সিঁড়ির পরে ফাঁকা খানিকটা জায়গা, তা'র উত্তরে দু'খানি পাশাপাশি ঘর। একখানি দর্শনের বস্‌বার, পাশেরটা শোবার—তা'দের উত্তরে আবার একটা চওড়া বারান্দা, সেখান থেকে বড়ো রাস্তা দেখা যায়। উপর-উপর সব দেখে-শুনে ইন্দ্রাণী দর্শনের শোয়ার ঘরে এসে দাঁড়ালো; বল্‌লে—ঘর-দোর বিছানা-বালিশ সব এমন নোংরা করে' রেখেছিস কেন?

—নোংরা কই, বৌ-মা? বাবু তো দিব্যি এতে ঘুম যান।

—তোর বাবুর কি কিছু কাণ্ডজ্ঞান আছে? ইন্দ্রাণী সেই ময়লা বিছানার উপরই বসে' পড়লো। খুলে ফেল্‌লো জুতো, গায়ের থেকে আলগা করে' আনলো আঁচল।

মনোহর বল্‌লে,—তুমি কী খাবে, বৌ-মা?

—যা হয় দু'মুঠো হোটেল থেকে কিনে নিয়ে আয়। খিদে আর আমার বিশেষ নেই। তা'র চেয়ে আরেকটা জিনিসের আমার বিশেষ দরকার, মনোহর।

—কী?

—জল। স্নান করবার জন্যে অনেক জল চাই। গায়ে রাজ্যের ধুলো জমে' আছে, ভালো করে' স্নান না করতে পারলে আমি মরে' যাবো।

—তা'র জন্যে তোমাকে ভাবতে হ'বে না।

দুই ঘরে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে প্রত্যেকটি জিনিস দেখে, শুঁকে, নাড়াচাড়া করে' স্নান আর খাওয়া সেরে নিতে-নিতে ইন্দ্রাণীর প্রায় তিনটে। শীতকালের বেলা, ঝুপ্‌ করে' পড়ে' এলো দেখতে-

দেখতে। খাওয়া-দাওয়া সেরে জিনিস-পত্র আর পর্য্যবেক্ষণ নয়, লেগে গেলো এবার সে তা'দের সাজাতে-গুছোতে, পরিপাটি, ফিটফাট ক'রে রাখতে। দড়ির উপর কাপড়-চোপড় তেমনি এলোমেলো, টেব্‌ল্‌টা বইয়ে-কাগজে ছত্রখান।

মনোহর এগিয়ে এসে বল্‌লে,—তুমি এই সব ধুলো ঘাঁটবে কী, বৌ-মা? আমি তবে এসেছি কী করতে?

ইন্দ্রাণী হেসে বল্‌লে,—আর আমিই তবে এসেছি কী করতে শুনি? যা, শিগগির উনুন আগুন দে গে, যা। তোর বাবু আপিস্ থেকে এসে কী খায়?

—কোনো-কোনোদিন দই-চিঁড়ে, কোনোদিন বা রুটি-বিস্কুট। কোনদিন আবার আপিস থেকেই কী খেয়ে আসেন।

—চা খায় না?

—নিজের করে' নিতে হয় বলে' আপিস থেকে এসে আর উঠতে চান্ না।

—তুই আছিস কী করতে?

—আমি ভালো করে' ওটা এখনো শিখলাম না, বৌ-মা। মনোহর হাত কচ্‌লাতে-কচ্‌লাতে বল্‌লে: আমাকে তুমি শিখিয়ে দিয়ো, কেমন?

—আচ্ছা, দেবো। আপিস থেকে এসে বাবু তোর কী করে রে?

—জামা-কাপড় ছেড়ে তক্ষুনি বিছানায় লম্বা হ'য়ে পড়েন, বৌ-মা। বেজায় খাটনি যে। চেহারা এমনি কালি হ'য়ে গেছে।

—হ'বে না, তুই যখন আছিস্ রেঁধে খাওয়াতে? যা, এই দু'টো টাকা নে, ভালো দেখে আধ সের ঘি আর ময়দা নিয়ে আয়। উনুনটা ধরিয়ে দিয়ে যাস্। আমি ততোক্ষণে ঝাঁটপাট দিয়ে বিছানা করে' রাখছি। শোন্, মনোহর।

মনোহর ফিরে দাঁড়ালো।

ইন্দ্রাণী বল্‌লে,—লোহার এই ক্যাম্প খাটটা সরিয়ে ফেলতে হ'বে ঘর থেকে। শোবার ঘরে এতো সব জঞ্জাল রেখেছিস কেন? নে, আমিই ধরতে পারবো, বাইরের ঐ বারান্দায় রেখে আসি।

নির্বোধ মনোহর চোখ বিস্ফারিত করে' বল্‌লে,—বাবু যে ওটাতে শোয়, বৌ-মা।

ইন্দ্রাণী হাসি চেপে বল্‌লে,—তা নিয়ে তোর মাথা ঘামাতে হ'বে না। যা বলছি, তাই কর্। ধর্ খাটটা।

খাটটা সরিয়ে রেখে মনোহর গেলো উনুন ধরাতে।

ইন্দ্রাণী সতরঞ্চি বিছিয়ে মেঝেতে ঢালা বিছানা করলে—দু'জনের মতো, দর্শনের বিছানার সঙ্গে নিজের বিছানাটা সে মিলিয়ে দিলো। তা'র গা-ময় স্পর্শের মতো নরম বিছানা। পাশাপাশি বালিশ সাজিয়ে রাখলে, পায়ের দিকে পাশাপাশি দু'খানা লেপ। তা'র গা-ময় স্পর্শের মতো নরম লেপ।

উনুনে আগুন দিয়ে মনোহর যখন উপরে এলো, দেখলে ইন্দ্রাণী মেঝেয় বিছানা পেতে তা'র উপর শুয়ে-শুয়ে একটা বই পড়ছে।

ঢোঁক গিলে মনোহর বল্‌লে,—উনুন ধরিয়ে আমি এবার বাজারে চল্‌লাম, বৌ-মা। ঘি আর ময়দা, আর কিছু তো আনতে হ'বে না?

ইন্দ্রাণী বল্‌লে,—কী আনতে হ'বে না হ'বে তা তো তুইই জানিস্‌। আমি তো আজ এলাম।

—রাত্রে বাবু তবে বাড়িতেই খাবেন তো?

—তা আমি কী করে' বলবো? তুই আছিস্‌ কী করতে? ইন্দ্রাণী ধমক দিয়ে উঠলো।

—হ্যাঁ, মনোহর একটা ঢোঁক গিলে বল্‌লে,—হোটেলকে তা হ'লে বারণ করে' দিয়ে আসতে হয়, আজ থেকে আর খাবার পাঠাতে হ'বে না। এই সঙ্গে কিছু আলু আর হাঁসের ডিমও নিয়ে আসি, কী বলো? রাত্রে না-হয় খিচুড়ি রেঁধে দিয়ো বাবুকে।

—তা তোর ভাবতে হ'বে না। শিগগির ফিরিস কিন্তু মনোহর, আমি একা থাকবো।

—সামনেই বাজার, তোমার কিছু ভয় নেই, বৌ-মা। নিচে সদরের পাশে ছিমনলাল ডালপুরি ভাজে, তা'কে তোমার কথা বলে' যাচ্ছি, সে চোখ রাখবে।

—কাউকে তোর চোখ রাখতে বলে' যেতে হ'বে না।

মনোহর হেসে বল্‌লে,—তা হ'লে উঠে এসে সদর বন্ধ করে' দাও। বাবু কিন্তু এক্ষুনি এসে পড়বে, বৌ-মা।

—যা তুই, উঠছি।

উঠি-উঠি করে'ও এই বিছানা ছেড়ে ইন্দ্রাণী কিছুতেই উঠতে পারলো না। কতোক্ষণ কাটলো কে জানে, হঠাৎ শুনতে পেলো সিঁড়ি দিয়ে উঠতে-উঠতে কে ডাকছে: মনোহর! মনোহর!

সেই শব্দের উত্তরে, সমস্ত ঘর-দোর, মেঝে-দেয়াল যেন একসঙ্গে গভীর নীরবতায় প্রতিধ্বনি করে' উঠলো।

শোবার ঘরে না ঢুকে বসবার ঘর দিয়ে দর্শন বাইরের বারান্দায় চুলে' এলো। আপন মনে বলতে লাগলো: ব্যাটা দেখি আজ ঘর-দোর খুব পরিপাটি করে' রেখেছে। হ'লো কী? উনুনে ধোঁয়া দিয়েছে দেখতে পাচ্ছি যে! এই বাড়িতেই তো, আমাদেরই তো রান্নাঘরে। ব্যাটা কি আজ আমার শ্রাদ্ধের রান্না বসিয়েছে নাকি? মনোহর! মনোহর!

কোনো সাড়া নেই।

—ব্যাটা এ-সময় গেলো কোথায়? দর্শন আপিসের জামা-কাপড় ছাড়তে লাগলো: উপরে ব্যাটা জল রেখে যায় নি নিশ্চয়। ফিরুক্ আজকে হারামজাদা।

দর্শন দাঁড়িয়ে পড়লো।

—এ কী? আমার খাট এখানে? মনোহর!

দর্শন দ্রুত পায়ে ছুটে এলো শোবার ঘরে।

ইন্দ্রাণী তাড়াতাড়ি লেপটা গায়ের উপর মাথা পর্য্যন্ত টেনে দিয়ে, প্রায় জুজুর ভয়ে ছোট খুকির মতো জড়োসড়ো হ'য়ে শুয়ে রইলো। দর্শন ঘরে ঢুকে উঠলো প্রবল চীৎকার করে': ব্যাটা পাজি, আমার বিছানায় লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে লম্বা ঘুম মারা হচ্ছে। আরামের একেবারে যে হিমালয় দেখছি। ডাকলে হারামজাদার: কানে ঢোকে না। দর্শন তা'র গায়ে সবেগে পায়ের ঠোকর দিতে লাগলো: মনোহর, ও শূয়ার!

তবু তা'র কোনো সাড়া নেই।

—রাস্কেলটা মরে' গেছে নাকি? বলে' লেপটার এক প্রান্ত ধরে' দর্শন সজোরে একটা টান দিলে—মেঘের ঢাকা থেকে বেরিয়ে এলো উচ্ছৃঙ্খল পূর্ণিমা, লেপের তলা থেকে এলোমেলো চুলে-আঁচলে, ঝিকিমিকি হাসিতে-লাবণ্যে, বিস্রস্ত, বিহ্বল ইন্দ্রাণী।

—তুমি?

একমুহূর্ত্তে দর্শন অনড় একটা পাথর হ'য়ে গেলো।

ইন্দ্রাণী খিল্-খিল্ করে' হেসে উঠলো; হাঁটু গেড়ে বসে' দর্শনের একটা হাত চেপে ধরে' টেনে তা'কে বিছানার এক পাশে বসিয়ে দিলে: আমাকে ধরে' দেখ, আমি ভূত নই। আমি—আমি।

—তুমি এখানে কী মনে করে'? হাত ছিনিয়ে নিয়ে দর্শন কঠিন, কটুকণ্ঠে জিগ্‌গেস করলো।

—কী আবার মনে করে'? নতুন চাকরি পেয়েছি যে একটা। কথা বলবে, না হাসবে, ইন্দ্রাণী ভেবেই পাচ্ছে না।

—চাকরি? এখানে আবার কী চাকরি?

—এই। বলে' ইন্দ্রাণী ব্যাকুলতায় নিটোল বাহু দিয়ে দর্শনের গলা জড়িয়ে ধরে' তা'র ঠোঁটে গভীর একটা চুমু খেলো।

অতি কষ্টে দম নিয়ে দর্শন বল্‌লে,—এ আবার কী অভিনয়! তুমি তো আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছ।

নিবিড়তরো আলিঙ্গনে বুকের কাছে মুখ এনে ইন্দ্রাণী হাসিমুখে বল্‌লে,—এবার তুমি আমাকে তাড়াও। বাবাঃ, কী

[illegible] আমাকে দি[illegible] বদমাইস, [illegible]—
[illegible]lth of vocabu[illegible]ries! শেষে লাথি পর্য্যন্ত [illegible]লে! মা গো!

দর্শন হতবুদ্ধির মতো তা'র দিকে তাকিয়ে রইলো।

আবার একটা চুমু খেয়ে ইন্দ্রাণী বললে,—কিন্তু সব, সব—**now drowned in a kiss.**

বাইরে থেকে দরজার আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে মনোহর বললে,—বাজার করে' ফিরেছি, বৌ-মা। উনুন যে এদিকে বসে' যাচ্ছে। বাবুর খাবারটা—

—যাই। ইন্দ্রাণী খুসির তরঙ্গে ঝলমল্ করতে-করতে উঠে দাঁড়ালো। বল্লে,—বাবুর জন্যে ওপরে জল নিয়ে আয়, মনোহর। আর শোন্।

সাহস পেয়ে মনোহর কাছে এসে দাঁড়ালো।

—খবরদার, আমাকে তুই আর বৌ-মা বলতে পারবি না। ইন্দ্রাণী গম্ভীর মুখে বল্লে,—আমি এখন এ-বাড়ির গিন্নি, আমাকে এবার থেকে দস্তুরমতো মা বল্বি। মনে থাকে যেন। আগে থেকে কিন্তু সাবধান করে' দিচ্ছি, মনোহর।

মনোহর পরম আপ্যায়িত হ'বার ভঙ্গি করে' বললে,—সে আমার সব সময় মনে থাকবে, বৌ-মা।